অতুল্য ঘোষ

নবজীবন

প্রথম প্রকাশ
১৪ই ফাল্গুন ১৩৬৯

প্রকাশক :

সুকুমার দত্ত
'নবজীবন'
১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

মুদ্রাকর :

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদসজ্জা :

অজিত গুপ্ত

দাম : ২·৫০ ন.প.

ভূমিকা

জ্যেঠুকে মধ্যে মধ্যে বাইরে যেতে হয়। কখনও বা কাজের জন্যে কখনও বা শরীরের জন্যে। সেই সময় আমরা তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত-ভাবে চিঠি পেয়ে থাকি। এইরকম কতকগুলি চিঠি আমার কাছে জমে গিয়েছিল। চিঠিগুলি আমার কয়েকজন বন্ধুকে দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তাদের আলোচনা শুনবার পর মনে হয়েছে যে চিঠিগুলো প্রকাশ করা উচিত।

ইতি
মীরা দত্ত
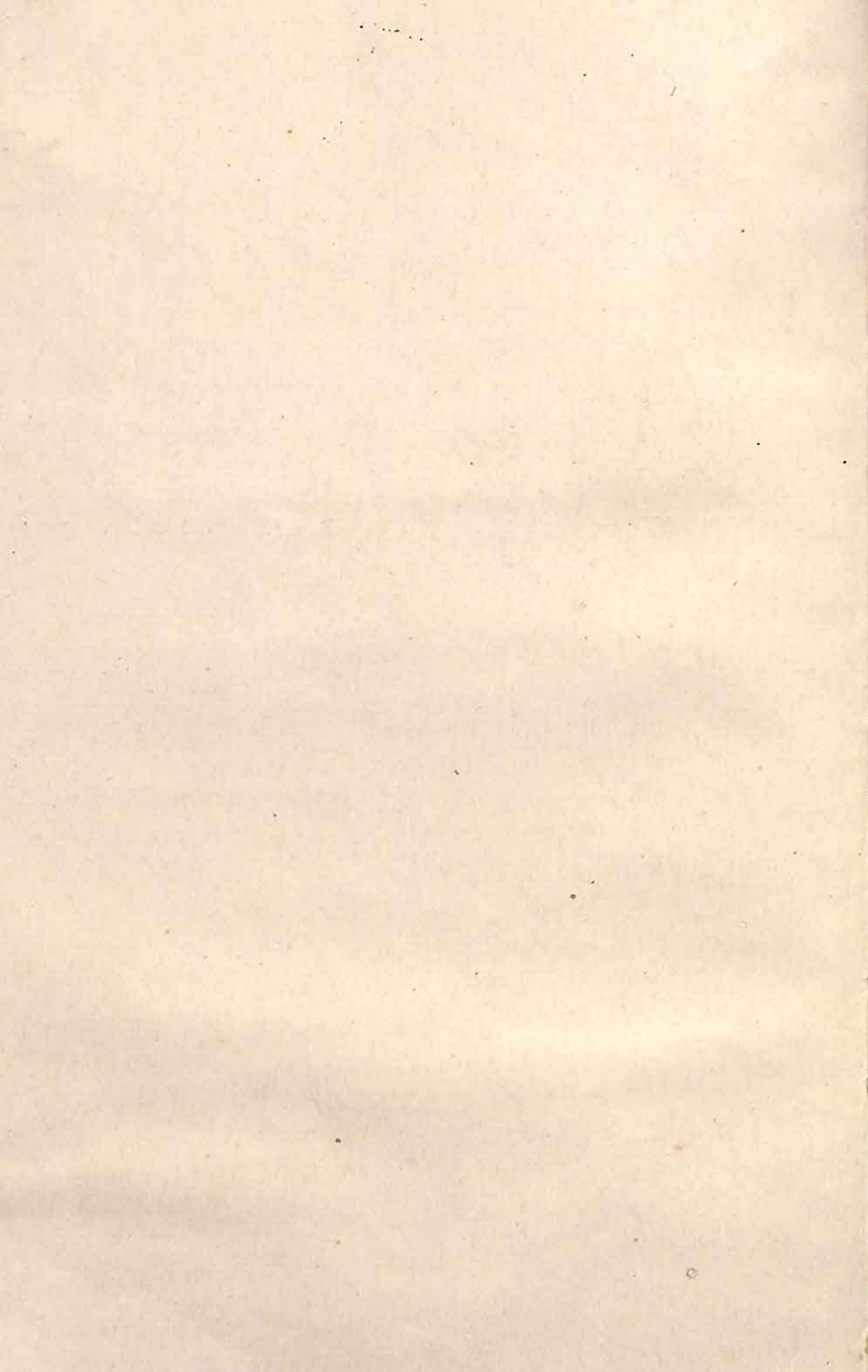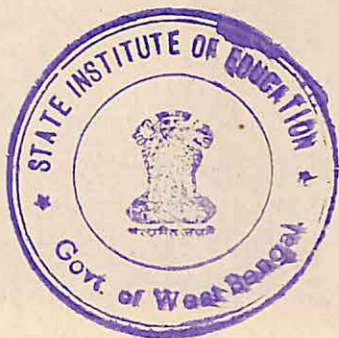
দেওলাগড়া
৩০।১২।৫৯

মাঙকুমা,

কলকাতা ছেড়ে যখন বেরোই তখন সব সময়ই মনের মধ্যে একটা আচ্ছন্ন ভাব থাকে। যাদের ছেড়ে আসছি—তাদের, স্বল্পকালের জন্য হলেও, তাদের কথা বার বার মনে পড়ে এবং খানিকদূর অবধি সে অবস্থা অতিক্রম করা যায় না।

আশে পাশে যা নোংরা। শিল্পাঞ্চল বলে যা অভিহিত হয় অর্থাৎ গঙ্গার ধারের প্রায় ২৫ মাইল তা প্রায় মানুষের বাসের অযোগ্য। অনেকদিন আগে একজন লিখেছিলেন যে গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল। আজ সে কথা মনে পড়লে বিস্মিত হতে হয়। এত নোংরা, এরা হলো সভ্যতার বাহন। যেখানেই সহর তার পাশেই বস্তি। আর গঙ্গার পারে বড় বড় কলগুলো কালোধোঁয়া ছড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে আবার তাদের ময়লা-জল রাস্তার বুক চিরে গঙ্গার জলকে দূষিত করছে। এই নিয়েই আমাদের সভ্যতা আজ তার ঠাট বজায় রেখেছে। যত লোক ধরে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক আজ প্রাণপণ করে খেটে চলেছে এই সব সহরের মধ্যে মাথা গোঁজবার জায়গা করার জন্য। কোন নিয়ম নেই, সঙ্গতিজ্ঞান নেই। ক্রমাগত লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর শেষ কোথায়।

কলকাতা থেকে পুরুলিয়া বেশ অনেকটা পথ, চোখ খুলে গেলে যে দিন অনেক বছর আগে চলে গেছে সেটাও সামনে এসে দাঁড়ায়। আবার আজকের ভারতবর্ষের রূপটাও যেন চোখে ধরা পড়ে।

ভাগীরথীর ধার দিয়ে ফরাসী, ইংরাজ, দিনেমার, ডাচ, পর্তুগীজ জেঁকে বসেছিল। ভারতবর্ষকে ভাগ করে নেবার জন্য সেদিনের ভারত এদের সাদর আহ্বান জানায়নি। এরা নিজেদের খুশীমত জায়গা বেছে নিয়েছিল এবং সেইসব জায়গায় এদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। এদের

দৃষ্টি ছিল নিজেদের সাগরপারের দেশের দিকে, সেইজন্য এরা এদেশকে বোঝবার চেষ্টা করেনি—সকলেই এমনভাবে বসেছিল যেন একান্ত সাময়িক অথবা এটা হয়ে উঠবে তাদের বিলাস ও সমৃদ্ধি যোগাবার উপাদান মাত্র। ফলে সকলকেই বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হয়েছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে এরা নিজের করে নিতে পারেনি। এদের আসার ফলে ভারতবর্ষের যা লোকসান সেটা ভারতবর্ষকে ততটা আঘাত করতে পারেনি। ভারতবর্ষ আত্মসম্বিত হারাবার ফলেই না এরা নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছিল। আর যে দেশ নিজেদের সত্ত্বা হারিয়েছিল তাদের আবার লাভ লোকসান কি? এর হিসাব তো তখনকার দিনে করবার লোক ছিল না। আজ হিসাব করতে গিয়ে দেখা যায়, লাভের অংকও মন্দ নয়। এদের মধ্যে থেকেই এমন লোক বেরিয়েছিলেন যাঁদের বাংলা সাহিত্যের জনক বলা যায়। আমি কেরী-মার্সম্যানের কথা বলছি। ভাগীরথীর আওতা শেষ হলেই চোখে পড়ে সাতগাঁয়ের জংগলের ধারে সরস্বতী। কত-দিনের বিস্মৃত অধ্যায়ের একটা জীর্ণ কংকালের সাক্ষ্য নিয়ে বয়ে চলেছে। একে দেখে কি বিশ্বাস হবে এর ধারে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর গড়ে উঠেছিল, যেখানে পৃথিবীর বহুদেশের জাহাজ বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। মিউজিয়মে জলপথ রাখার জায়গা আছে কি? তাহলে এটাকে এর বর্তমান পরিবেশ থেকে ছিন্ন করে এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান উচিত। আর একটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে দামোদরের নতুন খাল। এই খাল দিয়ে নৌকা চলাচল করে দামোদর আর ভাগীরথীকে যুক্ত করবে। দামোদরের যে জল বরাবর এ অঞ্চলে সর্বনাশ বহন করে এসেছে তাকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা বুঝি সত্যই সফল হলো। এখনও কিছু কাজ শেষ হতে বাকী। কিন্তু যতদূর কাজ এগিয়েছে তাতে মনকে খুশী করে দেয়।

বর্ধমান। কার্জন গেটের ধার দিয়ে যাবার সময় বর্ধমানের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা বার বার করে মনে পড়িয়ে দেয়। আর উদ্দেশ্যহীন এই সমৃদ্ধির শেষ পরিণতির কংকালস্বরূপ গোলাপবাগ, কৃষ্ণসাগর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সবই বালিতে যেন পদচিহ্ন স্থায়ী করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। বাস্তব হলো মহারাজকুমারের পেট্রল পাম্প। এ যেন জমিদারী

প্রথার অবাস্তব রূপ ও ভঙ্গীর বাস্তব প্রতিবাদ। আজকের চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল। চোখ খুলে গেলে কি পুরুলিয়া পৌঁছুতে পারব?

এখন ৭—৩০টা। সন্ধ্যা। বুড়ী, মালক্ষ্মী, নীতিশ, কালিকিঙ্কর লুডো খেলছে। খেলাটা ঠিক শুকনো সরস্বতীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যাকে নিয়ে লুডো খেলা প্রাণ পেয়েছিল বাড়িটা যেন তাকে খুঁজছে।

জ্যেঠু।

দেওলাগড়া
৩১শে ডিসেম্বর '৫৯

মাঙকুমা,

তুই তো বালি ব্রিজ অনেকবার পেরিয়েছিস, কবে যে সেটাকে বিবেকানন্দ ব্রিজ করা হলো সেটা আমার খেয়াল নেই। আগের নামটা কি ছিল? উইলিংডন? বিবেকানন্দ ব্রিজ নাম দিয়ে এরা ভাবল যে দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়কে বুঝি জুড়ে দেয়া হলো,—তা কি জোড়া যায়? দক্ষিণেশ্বর তো দক্ষিণেশ্বরই থেকে যাবে। সেখানে একটা মানুষ কোন পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজেকে গোটা মানুষে রূপান্তরিত করে গেছে। তার না ছিল বিদ্যার বালাই আর না ছিল আভিজাত্যের অহঙ্কার। অন্য সাধু তপস্বীর কথা ছেড়ে দিই,— তাদের কথা অনেক সময় সামাজিক মানুষেরা বুঝতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরীশ ঘোষ—এঁরা কোন আকর্ষণে এই মানুষটাকে প্রণতি জানিয়েছিল? আজকের সভ্যতায় দক্ষিণেশ্বর একটা পরম বিস্ময়। আর রামকৃষ্ণের জ্ঞানের উৎস খুঁজে বার করতে কোন পণ্ডিতই পেরে ওঠেনি। কি করে ঘটল? দর্শন, উপনিষদ, শাস্ত্রের গোড়ার কথা লোকটা দিনের পর দিন বলে যেত। আর তখনকার দিনের পণ্ডিতরা অবাক হয়ে শুনতো। না পড়েছে পুঁথি, না পড়েছে কোন অধ্যাপকের টোলে। একদিকে তো এই জ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার উজাড় করা কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে—আর একদিকে কোথায় কোন মাঝির পিঠে কে চড় মেরেছে সেই পাঁচটা দাগ পিঠে ফুটে উঠলো। জ্ঞানীর শুকনো মন এমন কমনীয় হলো কি করে? দক্ষিণেশ্বরে এই অপরূপের সমন্বয় ঘটেছে। তার সঙ্গে বেলুড়? সেখানে তো একটা পদ্ধতি ধরে সাধনা চলেছে।

ভাগীরথীর পূব ধার ধরে যদি আর একটু এগিয়ে যাস্ সুরেন বাড়ুয্যে, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রামপ্রসাদের নামগুলো
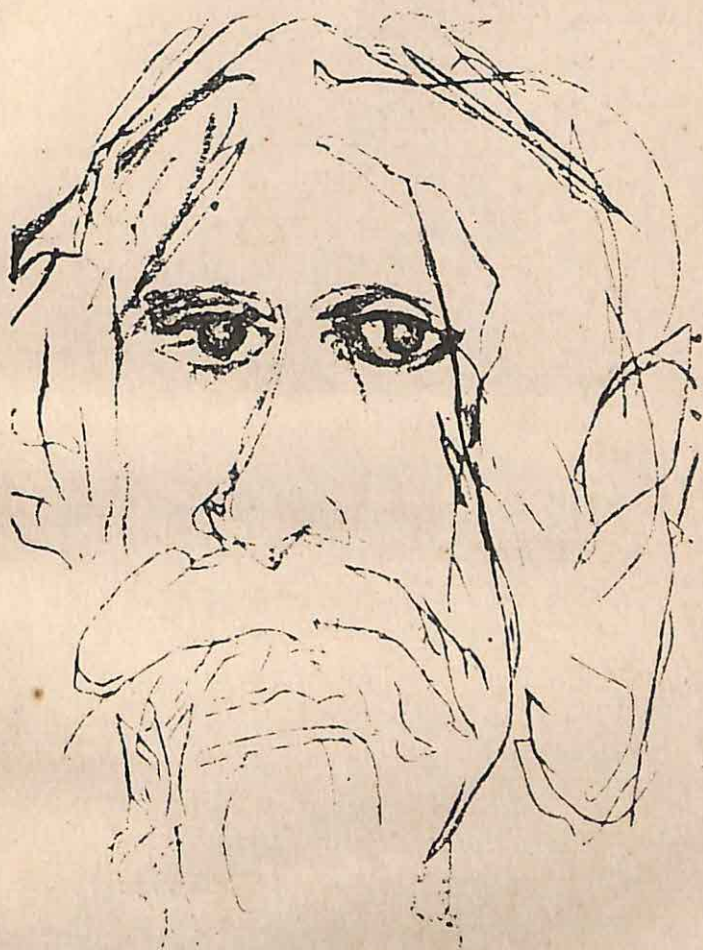
রবীন্দ্রনাথের আঁকা আত্ম-প্রতিকৃতি—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে
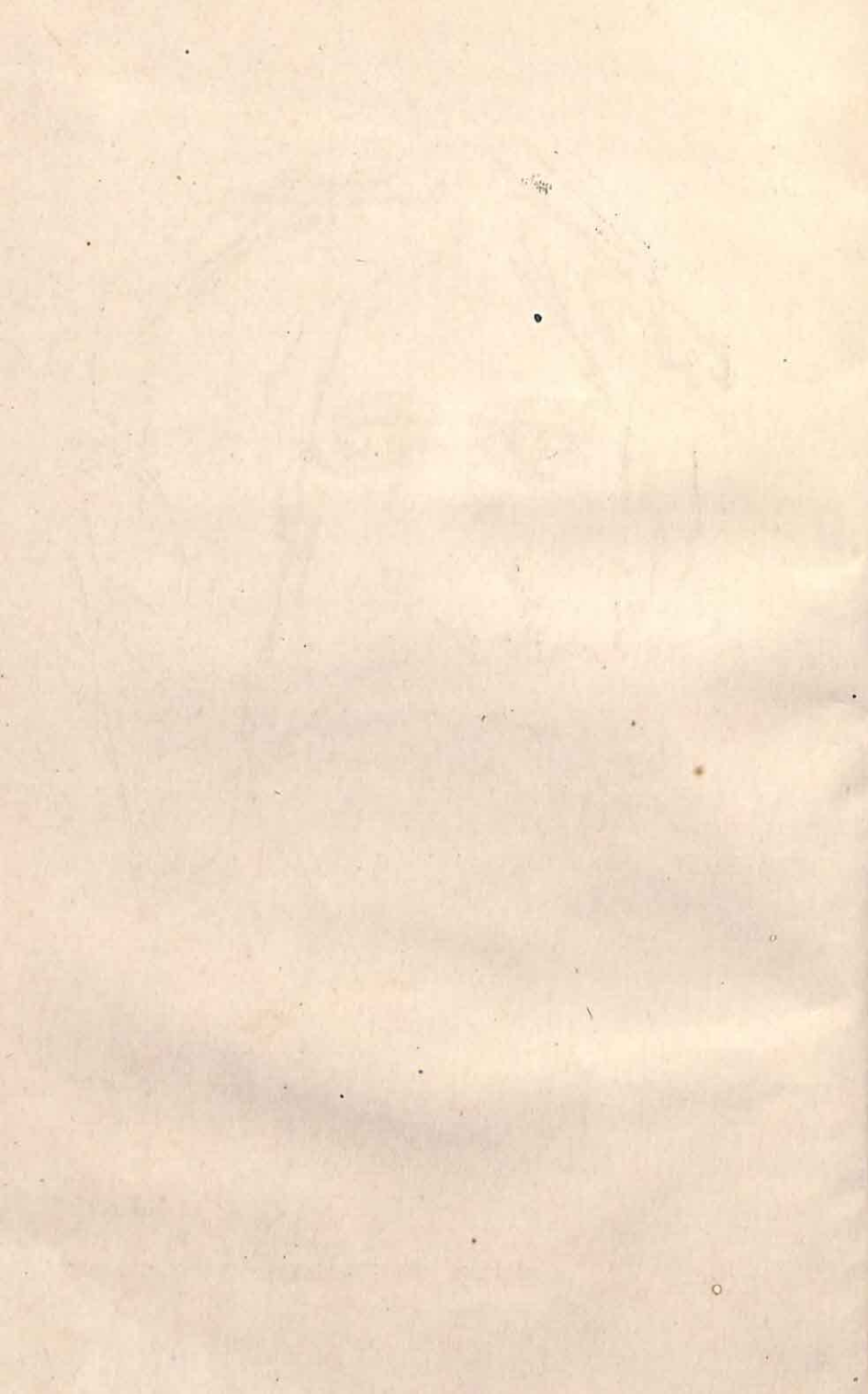
কালকে ডিঙিয়ে সামনে এসে হাজির হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামটা বুঝি লিখতে ভুল করলুম। কি দরকার বাপু? এত মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে আর পুরুলিয়া যাওয়া যাবে না। তার চেয়ে গঙ্গা পেরিয়ে পড়ি। উত্তরপাড়ার যে লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সেটা আর লাইব্রেরী নেই, সরকারী হাঁসপাতাল হয়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই তো শ্রীরামপুর। কেরী মাষ্টার মশাইর কথা তো আগেই বলেছি। প্রথম Type Foundry তো ওখানেই হলো। রাম কামারের নাম ভুলে গেছিস্ নাকি? তোদের বাড়ীর তো কাছেই। কোন্নগর পেরিয়ে চলে এসেছি কিন্তু অরবিন্দকে তো পেরোতে পারি নি। আরও খানিকটা এগিয়ে চলে যা। শেওড়াফুলি দিয়ে রাস্তা চলে গেছে তারকেশ্বর হয়ে —আরামবাগ হয়ে--কামারপুকুর। যে হাজার হাজার যাত্রী রোজ তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে যায় তারা কি জানে যে হরিপালের রাস্তাটা রেল লাইন পেরিয়ে চলে গেছে 'গুলটে', সেটা ধরে কবি হেমচন্দ্রের[৩] ভিটেতে পৌঁছানো যাবে? অবশ্য হরিপালের কাছেও সারদামিত্তিরের[৪] বাড়ীতে যাওয়া যায়। তারকেশ্বরে দামোদর পেরিয়ে যেমনি আরামবাগে ঢুকলে কিছু দূরে ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী—যাকে আধুনিক যুগে বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তক বলা হয়। ঐ রাস্তা ধরে গেলেই আবার রাধানগর। কার বাড়ী মনে আছে? রামমোহনের নাম ভুলতে বাঙালী কি কখনও পারবে? রামমোহনের ভিটের পাশেই আবার ভূপেন বোসের বাড়ী। আর তার পাশেই আবার সর্ব্বাধিকারী গোষ্ঠী—প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী,—সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। আর নাম করতে পারি না। আরামবাগে ঢুকলেই কিন্তু মনে পড়বে তোমাদের আধুনিক কালের ভাইসচ্যানসেলার জ্ঞান ঘোষের নাম। আর আগেই বলেছি রাস্তাটা চলে গেছে কামারপুকুরের দিকে। এই কামারপুকুরের গদাধরই তো দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ। আর এগিয়ে কাজ নেই বাপু পুরুলিয়ার পথ ধরা যাক। চন্দননগরের কানাই দত্ত ও তার সঙ্গীদের ছেড়ে ভূদেব ও অক্ষয়চন্দ্রের দেশ পেরিয়ে একেবারে বর্ধমানের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। পথে পড়ছে রামগোপাল ঘোষ ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। একজন বাগ্মী আর একজন শ্রুতিধর।

জ্যেঠু।

দেওলাগড়া
১লা জানুয়ারী, ৬০

মাংকুমা,

হুকুম রোজ একখানা করে চিঠি লেখার। এত কথা পাই কোথায়? অবশ্য মোটে তো বর্ধমান অবধি এসেছি—পুরুলিয়া এখন অনেক দূর। তবে পোঁছতে পারব বলে ভরসা হচ্ছে না। ঠিক বর্ধমানে ঢোকবার আগে বাঁকা নদী আছে—সেই বাঁকা নদীর পোলে ওঠবার আগে কলকাতা থেকে যাবার সময় বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। দামোদর পেরিয়ে আরামবাগ অবধি গিয়ে কামারপুকুরের পথের সংগে গিয়ে মিশেছে। এই রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার ধারেই একটা বড় দীঘি আছে। দীঘির ধার দিয়ে একটা মেঠো রাস্তা চলে গেছে, তিনমাইল গেলেই রাসবিহারী ঘোষের বাড়ী। একবার দেখতে গেছলুম। গ্রামের নাম 'তোরকোণা'। কি প্রকান্ড লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী যত্ন করার লোক নেই। বইগুলো নষ্ট হচ্ছে। বলেছিলুম National Library তে দিয়ে দেবার কথা।—যাঁরা বইগুলো পেয়েছেন অথচ বইএর কদর জানেন না তাঁরা সেগুলো আলমারীর মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। পোকায় নষ্ট হচ্ছে। এই রাসবিহারী ঘোষ আর টি. পালিত, এই দুজনের দানেতেই Science College ও যাদবপুর কলেজ সমৃদ্ধ হয়েছে। টি. পালিত-এর বাড়ী যেতে হয় চুঁচুড়া ষ্টেশন-এর তলা দিয়ে অমরপুর গ্রামে। দুজনেই আইন ব্যবসায়ী। সেদিকে নাম অনেক। রাজনীতিতেও রাসবিহারীবাবুর নাম আছে। এঁদের দানের তুলনা নেই।

আজকে তো ১লা জানুয়ারী। এটা হলো ইংরেজদের অর্থাৎ খৃষ্টান-দের বছরের প্রথম দিন। যিশুখৃষ্টকে অবলম্বন করেই বছর আরম্ভ হয়েছে। যিশুখৃষ্টকে আমার খুব ভাল লাগে। তুই তো দেখেছিস কত-রকমের যিশুখৃষ্টের মূর্ত্তি মাঝে মাঝে এনে রাখি। কিন্তু আমাদের

রোগ হচ্ছে যারা বড় হয়েছে তাঁদের সাধারণ মানুষ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা। সেইজন্য যখনই কোন বড়লোক এসেছেন তারপরে তার উত্তর-সাধকরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে খানিকটা অলৌকিকত্ব জুড়ে দেবার। বাইবেল তো খুব ভাল বই। আমি অবশ্য সাহিত্য বিচার করে বলছি না। সাহিত্যিকরা বলেন বাইবেলের যে ইংরাজি অনুবাদ King John করিয়েছিলেন সেটা নাকি ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। রামকৃষ্ণ যেমন সহজকথায় গল্পচ্ছলে লোককে বলতেন আমার বিশ্বাস যিশুও তাই করতেন। ছিলেন তো গরীব ছুতোর মিস্ত্রীর ছেলে। শেখেননিও বেশী, কাজে কাজেই তার পরে যে সব পণ্ডিত এলেন, Paul, Peter, Luke তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন উনি খুব বড় পণ্ডিত সেটা প্রমাণ করার। Romeএ যে Peter ও Paulএর গির্জা আছে না—সে এঁদেরই নামে। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ লিখে গেলেন যিশু সব কিছু টের পেয়েছিলেন। Judas যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাঁকে ধরিয়ে দেবে, Peter যে তাঁকে অস্বীকার করবে, এ সবই যিশু আগে থাকতে টের পেয়েছিলেন। এমন সাজিয়ে লেখা হয়েছে যে মনে হবে যেন এই অলৌকিকত্ব না দিলে যিশু বুঝি যিশু হতেন না। অবশ্য Luke আর Paul অনেক পরে এলো। তাদের তত দোষ দিই না। দোষ দেবার ইচ্ছে Peterকে। তোরা বোধহয় Big Fisherman বইখানা পড়েছিস্। ঐ যে 'Robe' বলে একটা বই অনেকদিন সিনেমায় চললো—সে বইটা যার লেখা Big Fisherman তারই লেখা। Big Fisherman তো Peterএর জীবনকেই অবলম্বন করে লেখা না? যিশু যদি ভবিষ্যদ্বাণী নাই করতেন তাহলে কি তিনি ছোট হতেন? এ যেন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল বলেই তিনি বড়—এইরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এতে তো হাসি আসে না, দুঃখ হয়। দুঃখ তা নয় যে যিশু সম্বন্ধে এইভাবে প্রচার করা হয়েছে, দুঃখ এই যে, এ ধারণা পৃথিবীতে প্রচার করা চলছে যে বড় হলেই তার সঙ্গে অলৌকিকত্ব আরোপ করতে হবে। যে লোক সব মানুষকে ভালবাসতে বললো—অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কি করে মানুষের মর্যাদা পেতে হয় তার জন্য প্রাণ দিল, তাকে অলৌকিকত্বের

অলঙ্কার পরাবার দরকার কি? সে তো সময় ও কালকে অতিক্রম করে বেঁচে আছে আর যতদিন মনুষ্য সভ্যতা থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবেও। তোর হয়ত আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—দেখি মহারাণীকে বলে যদি কোন নজির দিতে পারি। Peter asked; "Where are you going Master? Let me go with you."

"You cannot follow where I am going."

"I will follow you wherever you go, and do whatever you command, even if I must die for it."

Jesus looked about him, and said; "Before this night is out you will all be offended to be called my disciples. You will all be ashamed of your visions and of your prophetic mantles. When you are questioned, you will answer, "We are countrymen, we know no trade but cattle driving."

আর Judas সম্বন্ধে বলেন— As he walked away with three chosen disciples, James asked him: "Where is Judas? Why is he not with us?"

"I fear he has turned traitor and flinched from his task." ঘটলও তাই।

Judas muttered to the officer: "Arrest the man whom I kiss." He went up to Jesus and kissed him, and as he did so whispered reassuringly; "All is well. Trust Nicodemon." Then he shouted over his shoulder; "This is your man! This is Jesus of Nazareth."

Jesus asked; "Judas, do you kiss the man whom you betray?"

আর Peter সম্বন্ধে কি লেখা হ'লো?

At first cock-crow, the false alarm of dawn, Peter

stole into the hall, his sword concealed under his mantle. He looked around in the hope of finding Judas, whom he was determined to kill; but Judas was not there. Warming himself at the fire, he noticed for the first time that his fingers were bleeding—he has cut them on his sword while climbing into an olive-tree before leaping from an upper branch over the orchard wall. A cook asked him; "How did you wound your hand?"

"In the house of some friends of mine, in a rough-and-tumble."

"Who are you, eh?"

"I am a cattle man. I never had any other trade. I have just driven a prime herd of beef down from the north".

Then a maidservant said: "I know you, big lout! I saw you the other day at the Basilica during the riot. You are one of the Nazareth gang, a follower of that Jesus!"

"I am nothing of the sort".

"I could swear to it. I can tell by your i'od's and ain's that you are a Galilean".

"Forty crates full of plump harlots upon my soul, I never set eyes on this Jesus."

রাত বেড়েই চলেছে—

কি যে লিখছে তাড়াতাড়ি

দেখাচ্ছে না মোরে—

মন্বখের দিকে তাকিয়ে বলি

(যেন) আছি একটা ঘোরে—

ঘোরটা যখন কাটল দেখি
হলো যে দশ পাতা
রাত গড়িয়ে এলো মেন্‌কা
(এবার) বন্ধ করি খাতা।
ওঘরেতে পুরোদমে
চলে চাইনীজ চেস্‌
নীতিশ কাবু মা-লক্ষ্মীর কাছে
করবি কি বিশ্বেস?

জোঠু।

গিরিডি
৫।১।৬০ ইং

মাঙকুমা,

জি. টি. রোড ধরে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছি। বর্দ্ধমান তো আমরা পেরিয়ে এসেছি; এবারে পানাগড়।

কদিন যে চিঠি লেখা হয়নি তার জন্য আমার কোন দোষ নেই— দোষ যদি থাকে মহারাণীর। মহারাণী লেখাপড়া শিখেছে কিনা তাই indisciplined । দিচ্ছি আমি dictation তাতে ওর মতামতের দাম কোথায়; কিন্তু মুখটা খুসী খুসী গোমড়া করে এমন প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে আমার dictation দেওয়ার উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে। এতক্ষণ ছিল নীরব প্রতিবাদ এখন আবার বাঙময় হয়ে উঠেছে। কি বুঝলি?

অর্থাৎ কিনা ১লা জানুয়ারীর পরদিন ২রা থেকে উনি এমন উৎসাহ করে রাঁধতে লেগে গেছেন যে কিঙ্করদা তো একদম পাগল। অবশ্য কদিনই রেঁধেছেন, সেটা dictation না নেবার ছুতো মাত্র। তাছাড়া সময়েরও তো একান্ত অভাব—এদিকে সকাল ৯টা অবধি—দুপুরেও ঘণ্টা তিনচার, তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই ধস্তাধস্তি, এক জনের না ঘুমুতে দেবার আর আরেকজনের ঘুমুবার। অবশ্য মালক্ষ্মী ছিলেন— তাই ওদের দলটাই ভারি হতো, আমি হেরে যেতাম। ৩রা তারিখে আমরা এলুম আর ৪ঠো তারিখে কোকোর মানভঞ্জন। "নতুন নতুন বউ-দের নিয়ে বেড়ান"—তাই পাক্কা ৫ঘণ্টা বেড়িয়ে নিয়ে আসতে হলো। কোথায় জানিস; যেখানে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তুই লঞ্চ বিহার করেছিলি। তিলায়া।

পানাগড় দেখলে এখনও যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। ঐ যে বড় বড় লম্বা লম্বা টিনের ঘর গুলো দাঁড়িয়ে আছে—ওগুলো যেন মাটির গায়ে বড় বড় ঘা। ২য় বিশ্ব মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের গায়ে এমন যে কত ক্ষতচিহ্ন

রেখে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। মাটিকে নিরাভরণা করে প্রয়োজনের তাগিদে একদিন সব বড় বড় ব্যারাক গড়ে উঠেছিল। কত দেশের কত ছেলে এই সব জায়গায় নিয়মিত শিক্ষা নিত—কি করে অধিকতর অমানুষ হওয়া যায়। অর্থাৎ ভাবশূন্য হয়ে মানুষকে হত্যা করবার যে শিক্ষা, যুদ্ধ-কালীন ব্যারাকগুলোয় তারি পাঠ দেওয়া হয়। আর এই কাজে যার মন যত বেশী কঠোর হয় পুরস্কার সেই বেশী লাভ করে। বছরের পর বছর ধরে মানুষের মন থেকে এই সুকুমার বৃত্তিগুলি লোপ পাইয়ে দিয়ে এদের যন্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। অথচ "যন্ত্ররাজ বিভূতির" এখানে সাফল্য একান্ত সাময়িক। কারণ যুদ্ধকালীন শিক্ষা জীবনের মাঝে ছেদ টানতে পারে না। এদের মধ্যে থেকেই লোক বেরিয়ে দেশে শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করে তারি ফলে এত বড় দ্বন্দ্ব আজ সমাজে চলছে। যারা একাগ্রমনে শিক্ষা নিল ভাব, সমবেদনা ও সহানুভূতি বর্জনের তাদেরই আবার সৃষ্টিযজ্ঞের পুরোহিত হতে হয়, যার প্রধান উপাদান ভাবপ্রবণতা। এই পরস্পরবিরোধী কার্যধারার সমন্বয় হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য যুদ্ধ পৃথিবীর ও মানব সভ্যতার যে ক্ষতি করছে তার হিসাব কোনদিনই ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বহুবৎসর একাগ্র চেষ্টায় অনেক জোয়ানের খাটুনিতে যে সৌধ নির্মিত হয়েছে হঠাৎ যদি ভূমিকম্পে তা ভেঙে যায় তার একটা মানে হয়। কারণ প্রকৃতিকে পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এখনও আমরা আনতে পারিনি। কিন্তু সেই সৌধ যদি কিছু জোয়ানের কয়েক ঘণ্টার চিন্তাহীন পরিশ্রমে ভেঙে পড়ে তাহলে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকে না। যুদ্ধ হলো তাই। যুদ্ধ সমাজের ওপর এই ফলই এনে দেয়। একথা তো স্বীকার করতে কেউ কখনও পেঁছিয়ে যায় নি—যে যুদ্ধ করা খারাপ, যুদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং যুদ্ধের সঙ্গে মানব-সভ্যতার সঙ্গতি নেই। তবু তো যুদ্ধের শেষ হচ্ছে না। রূপ তো সেই একই আছে। তফাৎ হচ্ছে নামকরণে ও উপাদানে। পাথর ঘসে অস্ত্র তৈরী হলো, আবার যেদিন লোহা গলাতে শিখলো সেদিন অস্ত্রের রূপটা পরিবর্তন হলো, কিন্তু মনোভাব তো সেই রইল। ও পাথর ঘসাই বল আর লাঠিই বল—সময় সময় তার রূপ পরিবর্তন হয়েছে বর্শায়, খড়গে, বা তলোয়ারে, —তীর ধনুকে, বন্দুক কামানে। পরিণতি হলো Atom bomb এ।

মনোভাবের কি পরিবর্তন হলো? নাম হলো লুট, কখনও ডাকাতি, কখনও রাজ্যজয়—আবার সুবিধে পেলেই কোনটার নাম দেওয়া হয় দেশ-প্রেম, আদর্শপ্রতিষ্ঠা, কোনোটার বা—ধর্মপ্রচার। কিন্তু আসলে গলদ তো থেকেই গেছে। নামই বদলাক আর অস্ত্রের রূপই বদলাক, দেখেশুনে মনে হয় সেই আদিম মানুষের মন এখনও টি'কে আছে। উ'হু, টি'কে থাকা কথাটা ঠিক হলো না। বেশ জাঁকিয়ে বে'চে আছে। এর মরবারও লক্ষণ নেই, বদলাবারও লক্ষণ নেই। তাহলে কি পৃথিবীটা চলতে চলতে থেমে গেছে? ব্যর্থ হলো কি বুদ্ধের জন্মগ্রহণ? খৃষ্টের জীবনদানের কি কোন মূল্য নেই? কত নাম করবো? এই যে পরের পর যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষ মানব সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেদের আহুতি দিয়ে গেছেন তা কি নিষ্ফল হলো? এটা আমার জিজ্ঞাসা নয়। কারণ আমি জানি এটা নিষ্ফল হয় নি। নিষ্ফল হয়নি বলেই তো এই চিঠির ভেতর হঠাৎ এই কথাগুলো ঢুকে গেলো। ব্যর্থতার আর্তনাদ যদি মনকে ভারাক্রান্ত করতো তাহলে একটা বলিষ্ঠ মেয়ের কাছে চিঠি লেখার সময় এ কথাগুলো কিছুতেই প্রকাশ পেতো না। এ অবস্থার অবসান কবে হবে আমি জানি না তবে আমি বিশ্বাস করি মানব সভ্যতার যে চিরন্তনী ও শাশ্বত আদর্শ তা জয়ী হবে। সেইজন্য যাকে আজকের দিনে কেজো লোক বলে কেবলমাত্র তাদের নিয়েই আজ পৃথিবী ভর্তি হয়ে নেই। পৃথিবীকে নিত্য নূতন উপচারে মানুষ প্রণতি জানাচ্ছে। সাহিত্যে, কাব্যে, গানে, স্তোত্রে। ব্যবহারিক জগতের ক্ষমতা নেই অস্বীকার করবার। সেই জন্য সমাজের মধ্যে কামারশালায় হাতুড়ী তৈরী করবার ঘর যে আদর পায়, কবির লেখবার কলম যে কারখানায় তৈরী তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য থেকে গেছে। এদিকে যেমন চেষ্টা চলছে প্রকৃতিকে পূজো করবার, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে তাকে জয় করবারও চেষ্টার বিরতি নেই। ভীষণ ও সুন্দরে এই যে লড়াই এরই তো আর একটা প্রকাশ, মানুষের প্রকৃতি, আয়ত্তে আনবার সাধনায়। সমাজে আমরা কি মমত্ববোধ নিয়েই না বাস করছি। মমত্ববোধ আছে বলেই না সামাজিক মানুষ তার একান্ত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও সুখী। তা নইলে জীবনে প্রতি-দিনের যে সংঘাত, যে বিসম্বাদ তার কাছে হার মেনে মানুষ সমাজ থেকে

পালিয়ে যেত। হয় করতো আত্মহত্যা, নয় পরিণত হতো যন্ত্রে। রোজই তো বিতণ্ডা—ছেলের সঙ্গে বাপের, বাপের সঙ্গে মায়ের, ভায়ের সঙ্গে ভায়ের, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে। মাঝে মাঝে তো অসহ্যও মনে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তো আমরা আছি। শুধু আছি নয়, আনন্দে আছি। কেউ কেউ বলে এর নাম সহনশীলতা—আমি বলি এর নাম মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধের পূর্ণ বিকাশই মানবসভ্যতার এই সংকট থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। যেদিন আমাদের মমত্ববোধ পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশ, দেশকে অতিক্রম করে সমগ্র মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়বে সেইদিনই আমাদের সমাজজীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এ অতিক্রম মানে উপেক্ষা নয়—গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। গ্রহণ করার ভাবধারার যে বিস্তৃতি তাতেই এই মমত্ববোধের পূর্ণ পরিণতি।

কোথায় যে এসে পড়েছি আর কোথায় যে যাচ্ছি বুঝতেই পারছি না। আজকে এখানে শেষ করলে বোধ হয় মহারাণীর প্রতি একটু মমত্ব-বোধ দেখান হবে।

জেঠু।

'অরুণাবাস'
পচম্বা, গিরিডি
৬ই জানুয়ারি।

মাংকুমা,

চিঠিটা যে কি আকার নিচ্ছে তা এখনও বুঝতে পারছি না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আগে তো মানুষ নিজের গণ্ডী বা গোষ্ঠীর বাইরে খবরাখবর রাখতো না। সেইজন্য চিঠির প্রচলনও ছিল না। আর যখন যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা আদৌ হয়নি তখন অবস্থাপন্ন লোকেরা দূরে যেতে গেলে সপরিবারেই বেরুতো। বোধহয় চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা প্রথম লোকের মনে হলো টাকাকড়ির লেনদেন ব্যাপারে। হুণ্ডি বা পাঞ্জা এই দুয়েরই প্রচলনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। হুণ্ডি চলত টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারে আর পাঞ্জা চলতো রাজ্যশাসনের ব্যাপারে। এই দুটোই কিন্তু একদম কেজো কারণ। তারপর কিন্তু নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখন কাজের কথা ছাড়াও চিঠি লেখার প্রচলন হয়েছে। তোকে যখন চিঠি লিখব ভেবেছিলাম তখন ইচ্ছে ছিল যে, কোনোরকম কেজো কথা বা ভালকথা দিয়ে চিঠি ভারাক্রান্ত করব না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে মাঝে মাঝে অনেক কেজো কথা ঢুকে পড়েছে আর তুই হয়তো একটু একটু হেসেছিস। এমনও হয়তো মনে হয়েছে যে চাপা দেবার চেষ্টা করলে হবে কি—জ্যেঠুর পাণ্ডিত্য তো ফুটে বেরুবেই। আগুন কি ছাই চাপা থাকে। এ ঠাট্টা যে কতদিন চলবে তাই ভেবে আমি শিউরে উঠছি। কালকের চিঠিটা তো খুবই গম্ভীর হয়েছিল। ভাষার ছটা আর অলংকারের দ্যুতি ছিল না বলে যে লিখছিল তার মন ওঠেনি। আমার বিপদটাতো বুঝতে পারছিস। লিখতে আরম্ভ করেছিলুম বাস্তবধর্মী চিঠি। ভেবেছিলুম চিঠিগুলো হবে কাজের কথার ঠাসবুনন। কিন্তু তারা তো জোর করে কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল কাজে কাজেই

দরকারী কথাগুলো ছাড়া সব কথাগুলোই সামনে এসে হাজির হয়ে গেছে। এই ধর না—পানাগড় থেকে তো সোজা চলে যাওয়া যায়। কিন্তু পানাগড়ের ডান দিক দিয়ে যে রাস্তাটা বেরিয়ে চলে গেছে অজয় পেরিয়ে, ইলামবাজারের ঘাট হয়ে তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। তুইও তো ও রাস্তায় গেছিস। অবশ্য আগের সেই শালবনের ভেতর দিয়ে রাঙা মাটির পথ আর নেই। বিশ্বভারতীর উৎসবে প্রতিবৎসর জহরলালকে যেতে হয়, তারজন্য রাঙামাটির উপর পীচের আস্তরণ পড়েছে। আর গাড়ীর সমারোহকে সহ্য করবার জন্য রাস্তাটাও করতে হয়েছে অনেক প্রশস্ত। ফলে দুধারের পলাশ গাছগুলোর অপমৃত্যু ঘটেছে। ইলামবাজারের ঘাট পেরিয়ে, শিউড়ীর রাস্তা ধরে কয়েকমাইল যাবার পর ঐ রাস্তার পাঁচ মাইল দূরে কেন্দুবিল্ব। কার বাড়ী? তোরা তো জয়দেবের বই পড়েছিস। এই মাঘমাসে কি মেলাই হয়! কত বাউল আর কীর্তনিয়া যে আসে তা গুনে শেষ করা যায় না। আজকে কি একথা ভাবতে পারা যায় যে বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তরের একধারে ছিলেন জয়দেব আর একদিকে ছিলেন চন্ডীদাস। আর যেন ঠিক মেপে মাঝখানে হাজির হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভাবলেও মনটা যেন শিউরে ওঠে। এখন অবশ্য ময়ূরাক্ষীকে বেঁধে বীরভূমের ঊষর প্রান্তরকে উর্বর করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু সেদিনের বীরভূম? দিগন্তবিস্তারী ধূ ধূ করা মাঠে সবুজ প্রাণের চিহ্নও দেখা যেত না যেখানে সেইখানে কি করে এতবড় দুটি প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল? সংস্কৃত সাহিত্য যতদিন থাকবে জয়দেবের নাম ততদিন ঘুচবে না। জয়দেব তবু তোরা পড়েছিস বা শুনেছিস। সিনেমার দৌলতে হয়ত চন্ডীদাসের সঙ্গে একটু পরিচয় হয়েছে। শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় ৯।১০ মাইল দূর। একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের মধ্যে একটি পুকুরের ঘাটে একটি পাথর পড়ে আছে। সেটি দেখিয়ে লোকে বলে যে রামীধোপানী কাপড় কাচত। কিছু বালি ঢাকা পড়ে গেছল। ঘর দোর ছোট মন্দির। সেগুলো বেরিয়েছে। আমি যখন প্রথম গেছলুম তখন বর্ষা-কাল। ২।৩ জায়গায় মোষের গাড়ী থেকে নেমে পড়তে হয়েছে। এখন অবশ্য কালো চওড়া পীচের রাস্তা। বীরভূমে যেমন তিন কবির ক্ষেত্র তেমনি আবার ওখানে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীও অনেক জন্মেছে। তারাপীঠের

শান্তিনিকেতনে মধ্যাহ্ন—শ্রীনন্দলাল বসু
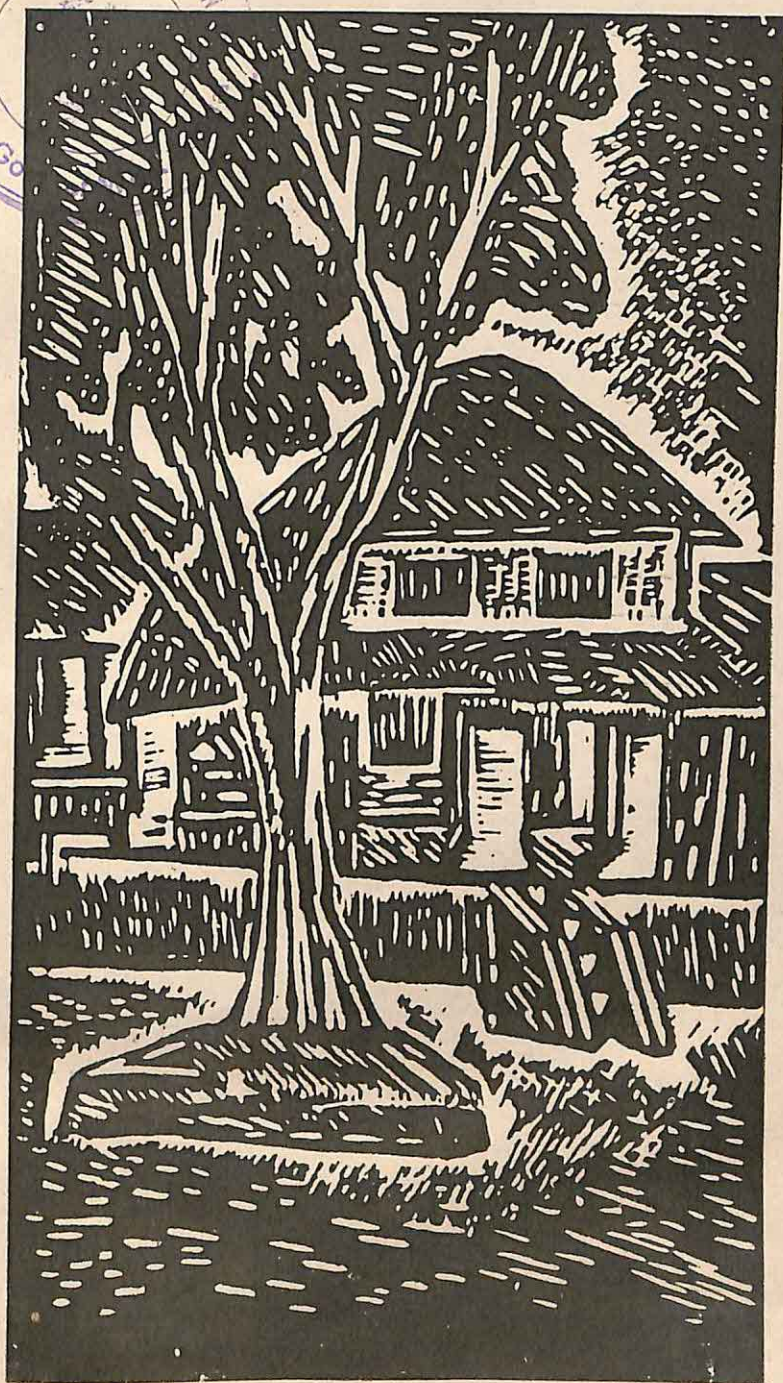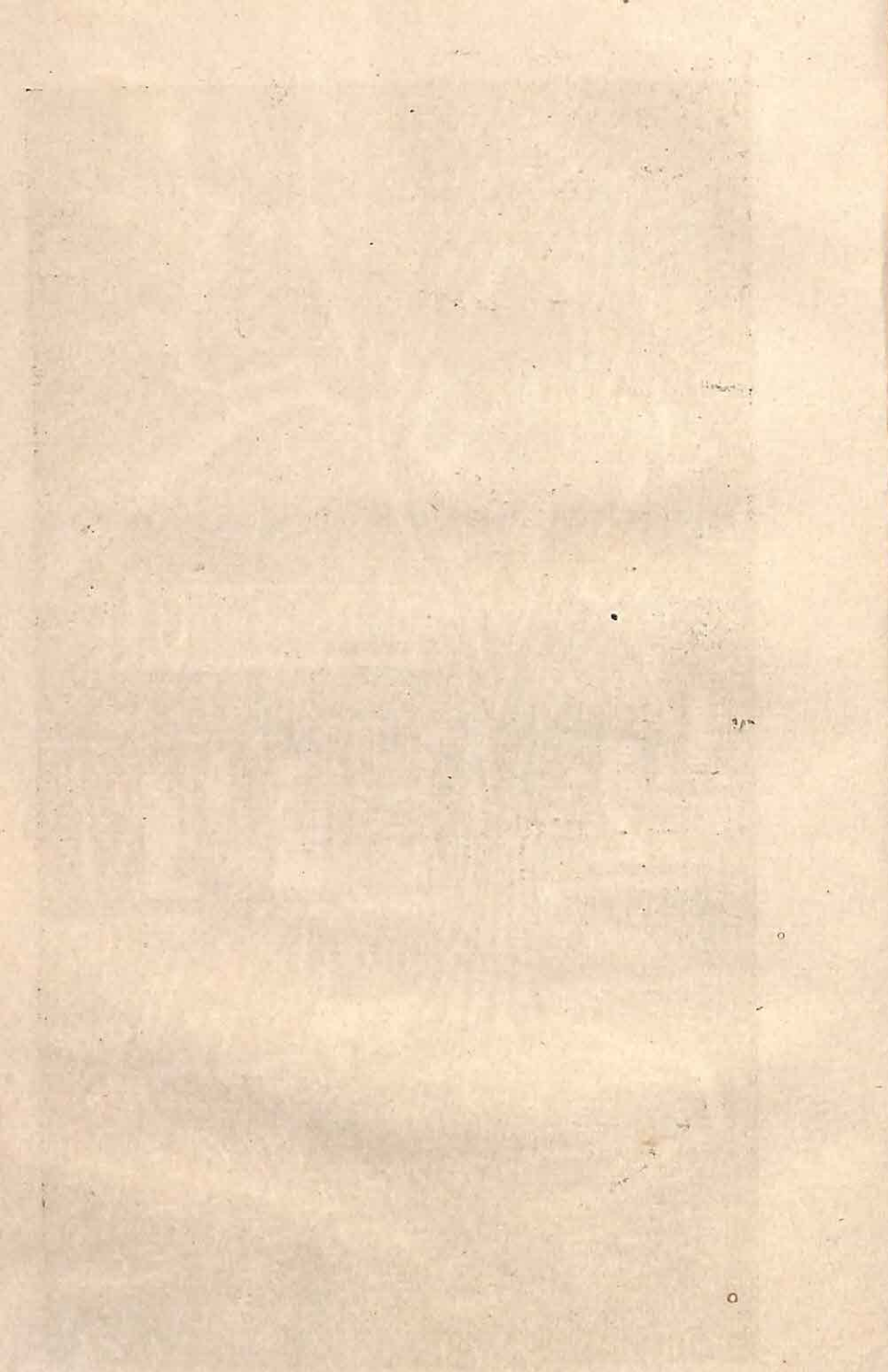
বামাক্ষেপার নাম শুনেছিস? বীরভূমে বক্কেশ্বর বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে অনেক গরম জলের ফোয়ারা আছে। জলটা ভাল নয়। বীরভূমে একটা গ্রামে একটা কীর্তনিয়া দল আছে তাদের খুব নাম। "ময়নাডাল" বলে। শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকমাইল দূরে। অনেকদিন আগে শাস্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। মহর্ষি ওখানেই সাধনার স্থান ঠিক করলেন কেন? শাস্ত্রীমশাইকে কি তুই দেখেছিস? আমি একবার শ্রীরামপুরে নিয়ে গেছলুম। শাস্ত্রীমশাইর বাড়ী মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে। আম বাগানের মধ্যে গোলপাতার একটি ঘরে বসেছিলেন। সেইখানেই তাঁকে প্রথম দেখেছিলুম। আমি বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা বলছি। শান্তি-নিকেতনে অনেক দিক্‌পাল এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে। তার মধ্যে শাস্ত্রীমশাই ও নন্দবাবু—এঁদের কথা ভোলবার নয়। আমরা একবার নন্দবাবুর সম্বর্ধনার জন্য শান্তিনিকেতন গেছলুম। মনে আছে? সে বছর আমাদের সম্বর্ধনা শুরু হয়েছিল শাস্ত্রীমশাইকে নিয়ে আর শেষ হয় নন্দবাবুকে দিয়ে। তুই ত আর রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাস নি। একটা দেখবার মত লোক ছিলেন। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জয়দেব আর চন্ডীদাসের জায়গায় যে রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির হয়েছিলেন এর মধ্যে একটা সংগতি আছে। এতে যদি তোমরা মনে করো আমি ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছি তাহলে ভুল হবে। আমরা রবীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতে সর্বক্ষেত্রেই তিনি অখন্ড এবং পূর্ণ। এখন তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিন। আমরা মানুষ হয়েছি রবীন্দ্র-সমালোচকদের আসরে। তোর বাবা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত বলে ঠাট্টার অন্ত ছিল না। ১৯২৪শে বোধহয় রক্তকরবী বেরুল প্রবাসীতে। মলাটে, যার নাম আজকাল প্রচ্ছদপট হয়েছে, মাকড়সার জাল। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেল্লুম। সেদিন সন্ধ্যায় অপরাধক্রমে বাংলাদেশের এক খ্যাতনামা পন্ডিতের কাছে বলে ফেলেছিলুম যে বড় ভাল বই। সে কি ভর্ৎসনা! কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারলুম না যে বইটা কোন জায়গায় বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঐ যে মুখবন্ধে লিখেছিলেন যে আমি যা লিখেছি তার যে মানে তোমরা করছ সেইটেই ধরে নিও। অন্য অর্থ করতে যেও না। এতেও জিনিসটা অনেকটা ধোঁয়াটে হয়ে

উঠেছিল। সেই সময় কিছুদিন আগে বা পরে 'ঘরে বাইরে' পোড়ান হয়েছিল। ঐ যে সন্দীপের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন না—যে রাবণ যদি জোর করে সীতাকে অঙ্কশায়িনী করতেন—এতেই একেবারে ঝড় বয়ে গেছল। তার আগে হয়েছিল 'ভুবন মনোমোহিনী' গান নিয়ে আপত্তি। মাকে মনোমোহিনী বলা। অবশ্য দেশবাসীকে অপমান করতে রবীন্দ্রনাথও কসুর করেন নি। নোবেল প্রাইজ পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল ট্রেন করে সকলে গেলেন। উনি তাদের মালা নিলেন না। এই আবহাওয়ায় আমরা মানুষ। কিন্তু হলে কি হবে, কেউতো রুখতে পারল না। এ যেন সব দরজা জানালা ভেঙে সূর্যের আলো এসে স্নান করিয়ে দিল। প্রবন্ধগুলো যদি মন দিয়ে পড়া যায় তাহলে গান বলে মনে হবে। মানুষের সব দিক যেন ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। আর কি ভাবেই মানুষকে ভালবেসেছেন। জায়গায় জায়গায় হয়ত অহঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে। তবে সে অহঙ্কার মর্যাদার। তাতে কোন কলুষ নেই, রিক্ততা নেই, গ্লানি নেই। তোর বাবাকে একটা কবিতার কথা বলেছিলুম। তোর বাবা বললে, রবীন্দ্রনাথের অমন কবিতা বড় বেশী নেই। সেদিন ওকে পড়ে শোনাবার ইচ্ছে হয়েছিল—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বল্লুম, সুন্দর—
সুন্দর, হলো সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।

মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তপজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ
না আমি, না তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি।'
সেই আমির গহনে আলো-আধারের ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস,
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে॥
একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত—
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে—
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ॥

আবার এই লোকই লিখেছেনঃ—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলা ঘরে কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

অদ্ভুত না?

আবার অন্যদিকে কি গভীর ভাব, কত সংক্ষেপে চণ্ডীদাস লিখেছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

মহারাণীর ইচ্ছে অনেকক্ষণ চালাই। সেটা কি উচিত হবে? আজ এই খানেই শেষ।

জ্যেঠু।

গিরিডি
৮ই জানুয়ারী, ১৯৬০।

মাঙকুমা,

কালকে তোর চিঠি পেয়েছি। চিঠির খানিকটা অংশ পড়ে মনে হলো—যে আমি আসার আগে যেটা ঠিক হয়েছিল সেটা বেঠিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোর আসা হয়ে উঠবে না। তোর চিঠিতে সবই আছে খালি এইটেই নেই তাই এই কথাটি আগে মনে পড়ল। অবশ্য এটা কিছুই নতুন নয়। অনেক দিনই তো আমায় বাইরে বাইরে থাকতে হয়। সেইটে আবার সুরু করব কিনা ভাবছি। কালকে খাবার সময় একসঙ্গে তিনখানা চিঠি। তোর, শিবুর আর সুজুর। আমাকে তো তিন ভাগ করা এখন সম্ভব নয়।

আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি তোদের রবীন্দ্রনাথ পড়াবার। কিন্তু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। বিদেশে লিরিকের জন্য ওঁর যে একটা খ্যাতি হয়েছে তার একটা মানে হয়। কিন্তু যে দেশের লোকে ওর সমস্ত লেখাই—ওরিজিনাল লেখা, পড়বার সুযোগ পেয়েছে তারা কি করে গানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটা ভাবা খুবই কষ্টকর। প্রবন্ধর কথা তো আগেই বলেছি। উপন্যাসগুলো পশ্চিমী সাহিত্যের উপন্যাস বিচারে—উপন্যাস হিসাবে হয়ত কদর কম পাবে কিন্তু বড় গল্প হিসাবে তো এর তুলনা নেই। তুই গোরা পড়েছিস্? একটা গোটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। একেবারে নিখুঁত ছবি। নাম তো সব আমার মনে নেই। আবার যোগা-যোগ না তিন পুরুষে কুমুর দাদা। তার ছবি জীবনে ভোলা শক্ত। শরৎবাবুর বিপ্রদাসের নাম হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিপ্রদাসের কি জোড়া মেলে? শরৎবাবুর বিপ্রদাসের কথা কল্পনা করা যায়। ও যেন একটা রণক্লান্ত তেজস্বী পুরুষ। আর কুমুর দাদা বিপ্রদাস—ও যেন

সব পাওয়া সব হারানোর ঊর্ধ্বে উঠে এক মহিমায় বিরাজ করছে। এখন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যদি আমি লিখি তাহলে যে কতদিনে শেষ হবে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ তোমার বন্ধুর এই সম্বন্ধে উৎসাহের অন্ত নেই। Dictation দিচ্ছি লিখবে—তার আবার মতামতের দাম কি? কিন্তু আধুনিকা তো, তায় আবার আসাম, বিহার, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ সবগুলো মিলিয়ে তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা প্রকান্ড ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। আমাদের দেশে সাহিত্য অনেকটা artificial হয়ে উঠেছিল। উঠেছিল বললে ভুল হবে, এখনও রয়েছে। তার ধাক্কা রবীন্দ্রনাথও সামলাতে পারেন নি। তৎকালীন সমাজে চিন্তাধারার দ্যোতক যে ভাবপ্রবাহ তার প্রকাশকেই সাহিত্য বলে। মাটির সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন সাহিত্য হতে পারে না। একটা চলতি কথা আছে না? আগে আসে সুর তারপরে আসে কথা। এই দুয়ের সংমিশ্রণেই সাহিত্য তৈরী হয়। সে সাহিত্যকে বাস্তবধর্মী বলা হবে কিনা জানি না কিন্তু সে সাহিত্য যে দেশ ও কালের শ্রদ্ধার উপরেই প্রতিষ্ঠিত সে বিষয় আমার মনে এতটুকু সন্দেহের কারণ নেই। ইংরেজের যে conquest সেটা এতো সামগ্রিক ও ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে আমরা বুঝি সবই হারিয়েছিলুম। ওর ভাল দিকটা আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু পরানুকরণকে অনুকরণ না মনে করে সেটা গ্রহণ করার যে গ্লানি তা আমাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছিল। এ থেকে সাহিত্যও মুক্তি পায়নি। বঙ্কিম যুগের পরেই সাহিত্যের উপর এই ভঙ্গীর প্রকাশ বেশী পেয়েছে। এইবার যেন মনে হচ্ছে এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে জায়গাটা আমার কাছে খুব মনোরম হলেও তোদের কাছে পছন্দসই নয়। সমালোচকের স্থান পৃথিবীতে বরাবরই থাকবে। কিন্তু রস পরিবেশনের সময় যদি কি করে রস তৈরী হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে যে শুধু রসের মাধুর্য নষ্ট হয় তা নয় রসভঙ্গের অপরাধেও অপরাধী হতে হয়। পৃথিবী তো আর কেন পেলুম না এই দুঃখ করেই তার সৃষ্টিলীলাকে ব্যাহত করতে চায় না। যা পেয়েছি তার আনন্দের দিকটা তুলে ধরাকে পৃথিবী মনে করে তার চরম সার্থকতা। কাজে কাজেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার আনন্দই আমাদের একান্ত হয়ে থাক। সর্বকালের ও সর্বস্তরের

জন্য সেটা হতে পারল কিনা এ ভেবে মনকে ক্লিষ্ট করে লাভ কি? পৃথিবীর ইতিহাসে যুগ ও কালকে অতিক্রম করে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে আছে। সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে কি শেষভাগে অর্থাৎ কোথাও রবীন্দ্রনাথ থাকবেন কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন করবে তার্কিকে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি—তাইতেই খুসী। শীতকালের রুদ্দুর ঘরে এসে পৌঁছেছে। ৭টা ১১ সেকেণ্ডএ রুদ্দুর উঠেছে কিম্বা ৩৭ সেকেণ্ডে উঠেছে সে আমাদের ভাববার দরকার কি। বিশ্ব কুঁড়ে যারা তারা তো বরাবরই বলে আসছে যে বাপু রুদ্দুর উঠেছে কি না তা আমি দেখতে চাই না। আমি লেপও ছাড়ব না চোখ চেয়ে ঘুমুবোও না। তা বললে তো আমার চলবে না কাজেই এখানেই শেষ করি।

তোমার বন্ধু অর্থাৎ আমার বৌমা অর্থাৎ, তোমার বৌদি এখনও ওঠেন নি। এ জায়গায় তোর সঙ্গে প্রকাণ্ড মিল। তুই এলে হয়তো লজ্জায় দুজনেই সকালের সূর্যকে প্রণাম করতে শিখতিস্।

জ্যেঠু।

গিরিডি
১৯।১।৬০ ইং

মাঙ্কুমা,

কবে শেষ চিঠি লিখেছি আর তাতে কি লেখা আছে কিছুই এখন মনে নেই। বাঁকুড়ায় যে কদিন ছিলুম সেকদিন চিঠি লেখার একটা মানে ছিল। এখানে তো বাড়ী ভর্তি। তাদের সঙ্গে কথা কইব না কেবল মাত্র তোর কথা মনে করেই দিন কাটাব। আজ তো খুব তোড়জোড় করে বসেছি। জানি না কতদূর এগুবে। আর তার ওপর মহারাণীর তো একেবারেই সময় নেই। নিয়মিত ভাবে ১৪ দফা ওষুধ। রান্নাঘরের তদ্বির, গাড়ী চালান, ভক্ত আর জয়শ্রীর গান এবং কোনো রকমে মাত্র কয়েকঘণ্টা ঘুমুনো। এইরকম একজন লোককে দিয়ে চিঠি লেখান কি শক্ত কাজ বুঝতে পারছিস্ তো। নেহাৎ তোর কথা ভেবেই বোধহয় বসা সম্ভব হয়েছে। কারণটা কি? ভয় না ভালবাসা? সব চিঠিগুলো পড়ার ধৈর্য থাক্‌ছে তো? আবার তো পরওয়ানা এসেছে আরও কয়েকদিন থাকবার। তাহলে নিশ্চয়ই আরও কয়েকখানা চিঠি হবে। তারপর তো গোটা ফেব্রুয়ারী মাসটা কলকাতায় আছি। আমার চিঠি লেখা মানে dictation দেওয়া। তাতে শিব বা বাঁদর যা হোক একটা কিছু দাঁড়াবেই।

রবীন্দ্রনাথের কথা এসে পড়েছিল শান্তিনিকেতনের উল্লেখে। প্রথমে বোধহয় চিঠিটা আরম্ভ করেছিলাম কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়া নিয়ে। তারপর কত কথাই যে লেখা হলো—শেষ অবধি তাল আছে তো? রসজ্ঞরা বলেন তাল কাটলেও চলে কিন্তু বেসুরো একদম অচল। পানাগড় অবধি এসেছিলুম। সেখান থেকে এগিয়ে কয়েকমাইল এলেই দেখবে লেখা আছে Durgapur Forest। আমাদের ছেলেবেলায়

এখানে ঠ্যাঙাড়েরা থাকত। জি. টি. রোডের দুধারে বন। এখনও বনের চিহ্ন আছে। তবে এ অঞ্চল আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী মহাসমৃদ্ধ হতে চলেছে। প্রথমে তৈরী হলো D.V.C. ব্যারাজ। Damodar Valley Corporation-এর যা পরিকল্পনা তার প্রথম অধ্যায়ে চারটি Dam আর দুর্গাপুর ব্যারাজ। এর তিনটি Dam শেষ হয়ে গেছে—তিলায়া, মাইথন, কোনার ও চতুর্থ Dam পাঁচেট সম্পূর্ণ প্রায়। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া বিভিন্ন অঞ্চলে সেচের জল পাঠান হবে। তার জন্য অনেক খাল কাটা হয়েছে। সবশুদ্ধ ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। আর একটি খাল কেটে গঙ্গা এবং দামোদরকে যুক্ত করা হচ্ছে। দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে খালটি ত্রিবেণীর ওপরে গঙ্গায় পড়েছে। ৮৩ মাইল খাল। এই খাল দিয়ে ছোট ষ্টীম লঞ্চ ও মালবাহী নৌকা যাতায়াত করতে পারবে। কোনারের কাছে বোকারোয় এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় থারমাল পাওয়ার ষ্টেশন হয়েছে। বাকি Damগুলিতেও জলবিদ্যুতের কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আমরা যে সব অঞ্চলে কাজ করেছি সেগুলো দামোদর এলাকা ভুক্ত। বছরের পর বছর দামোদর যে সর্বনাশ করে এসেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান দেশের সবচেয়ে প্রধান সম্বল, জল। কিন্তু আমরা তো নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করবার অধিকার হারিয়েছিলুম সেইজন্য দামোদরের সোনাফলান জল আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে দামোদরের জলে যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সে যে কত কোটি টাকা তার হিসেব নেই। স্বাধীন হবার পরই সেজন্য আমরা এই দামোদরকে সংযত করে একে কাজে লাগিয়েছি। সেইজন্যই দামোদর পরিকল্পনার নাম হচ্ছে বহুমুখী পরিকল্পনা। একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ তার সঙ্গে সেচের জল সরবরাহ। যার ফলে ধান এবং রবি শস্য প্রচুর ফলাবার সুবিধে হবে। Damগুলোয় মাছের চাষ হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আর যে Navigation Canal হয়েছে না—তাতে মাল যাতায়াতের ফলে খালের দুধারের গ্রামগুলোয় মাল পাঠাবার সুবিধে হবে। অর্থনীতির একটা বড় কথা Supply। সেইজন্য দেশকে

সমৃদ্ধ করতে গেলে মালপত্তর চলাচলের ব্যবস্থা বিশেষভাবে করতে হবে। D.V.C. এইভাবে একটি মহা কল্যাণকর কাজে অগ্রণী হয়েছে। এবারের বৃষ্টির কথা মনে পড়ছে তো? এবারে প্রমাণ হয়ে গেছে D.V.C.র এই Damগুলি না থাকলে বর্ধমান সহর প্রভৃতি অনেক অঞ্চল বন্যায় ধ্বংস হয়ে যেত। তার্কিকে এ নিয়ে তর্ক তুলতে পারে। আমরা কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ করছি এক এক বিরাট সৃষ্টি যজ্ঞের সূচনা। আজকের দিনেও যারা এতে অবিশ্বাস করে একে গ্রহণ করতে চাইছে না তারা দুর্ভাগা। আমাদের পুরাণের গল্প আছে ভগীরথ গঙ্গাকে বহন করে এনে দেশকে অভিশাপমুক্ত করেছিল। এই সব Dam বা খালের ধার দিয়ে যাবার সময় আমার মনে হয় যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে আমাদের জীবনে নবভগীরথের কাজ দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এতো গল্প কথা নয়। রোজই তো প্রত্যক্ষ করছি। যে জায়গা জনহীন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল আজ তা শস্য-শ্যামলা হয়েছে। এত বড় বড় কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও হয়তো ভুল হচ্ছে কিন্তু আজকের দিনে যারা সেই ভুলটাকেই সম্বল করে থাকবে তাদের দুর্ভাগ্য এই যে তারা এত বড় সৃষ্টির যে বিরাট আনন্দ তা থেকে নিজেরা বঞ্চিত হবে। পুরুলিয়া যেতে গেলে এই যে D.V.C.র ব্যারেজ তার ওপর দিয়েই যাবার রাস্তা। আর সহজেই কি পেরিয়ে যাবার উপায় আছে? ভারত সরকারের উদ্যোগে যে তিনটি ইস্পাত তৈরীর কারখানা হচ্ছে তার একটি এইখানে। ভিলাই ও রুরকেল্লা তুই দেখে এসেছিস—দুর্গাপুরটা তোর ভাল করে দেখা হয় নি। আবার এখানেই India Government একটা Thermal Power Station করছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার Coke Oven Plant করেছে আবার তার সঙ্গেই আবার একটা Thermal Power Stationও করেছে। আরও কত কারখানার আয়োজন যে হচ্ছে। রাশিয়ানদের সহযোগিতায় চশমার কাঁচ তৈরীর কারখানা শুরু হবার উপক্রম হয়েছে। মেশিন টুল্‌স ফ্যাক্টরীও হচ্ছে। আর এইখানে যারা কাজ করবে তাদের শেখাবার জন্য একটা বড় Technical Instituteএর পত্তন হয়েছে। এ যেন এক বিরাট যজ্ঞশালা। আমাদের

পুরাণের বিশ্বকর্মা তার সমগ্র আয়োজন নিয়ে যেন কাজে লেগে গেছে। একবার চোখ বুজে ভাব্ দেখি। কি কান্ডই হচ্ছে।

আজ এখানেই শেষ হোক।

জ্যেঠু।

গিরিডি
২২।১।৬০ ইং
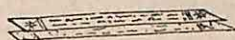
মাঙকুমা,

মহারাণীর বড় লজ্জা। তোকে এই চিঠি কিছুতেই লিখতে চায় না, একটু বকে দিস্।

এবারে ডাক্তার আর বদ্দু যে এসেছিল তাতে আমার নতুন নির্দেশনামা হলো যে আরও ৭ দিন বেশী থাকতে হবে। আমি তো বুঝতেই পারছি না কেন আরও ৭ দিন বেশী থাকব। আমি থাকলে কোকো আসবে। ব্যাস। জানে তো আর কিছু বলবার নেই। ফলে বাচ্চা মেয়েটাকে এখানে আটকে রেখেছি। ক্রিকেট খেলার এত হৈ চৈ অথচ ওকে এখানে আটকে রাখা হলো—তোর বউদি লোক ভাল নয়—কিছুতেই লিখতে চাইছে না আর। আমি যত বলছি কথাগুলো তো আমার—তবু খালি আপত্তি করছে। বলছে আর কিছুতেই লিখবে না। অগত্যা আমায় অন্য কথা লিখতে হলো।

আমার কাশি একদম সেরে গেছে। শরীরও খুব ভাল। যাবার সময় একদিন বাঁকুড়া ঘুরে যাব। জয়শ্রীকে আটকে রাখলুম, ওদিকটা দেখিস।

দুর্গাপুরে ব্যারেজ হয়ে ভারি সুবিধে হয়েছে। কলকাতা থেকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া যাবার রাস্তা খুলে গেছে। রাঁচী জামসেদপুরও কাছে হয়ে গেছে। আগে দামোদরএর ওপর একমাত্র পোল ছিল ধানবাদের কাছে। এখন দুর্গাপুরে তো হয়ে-ই-ছে, আবার পাঁচেটেও হচ্ছে। তোর তো মনে আছে আমরা রাঁচী থেকে বাঁকুড়া হয়ে কলকাতা ফিরছিলুম এবারেও সেই রাস্তায় আমরা পুরুলিয়া গেলুম। বাঁকুড়াকে খুব গরীব জেলা বলা হয়। বেশীর ভাগ জমি হয় পতিত নয় জঙ্গল। জঙ্গল যদি ভালভাবে তৈরী হতো তাহলে একটা আয়ের পথ হতো। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক গাছের মর্যাদা দিতে ভুলে গেছে। কত বছর যে গাছ বসান হয়নি তার হিসেব নেই। পুরুলিয়া বাঁকুড়া

এসব জায়গায় ছোট ছোট পাহাড়গুলো কাঁকরময় হয়ে উঠেছে। তার মানে এসব পাহাড়ের ওপর যত গাছ ছিল সব নির্মূল হওয়ার ফলে বৃষ্টির জলে মাটি সব ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। গাছগুলো থাকলে গাছের পাতায় বৃষ্টির জলে মিশে কাঁকরের ওপর মাটির স্তরটা ভালভাবে জমে উঠতো এবং তাতে গাছপালা আরও সজীব ও সতেজ হতো। এখন সেইজন্য সমস্ত অঞ্চলটাকেই প্রাণহীন নির্জীব মনে হয়। অথচ চেষ্টা করলে একে ফের বাঁচান যায়। মাঝে মাঝে সরকারী প্রচেষ্টায় পাহাড়-গুলোর ওপর গাছপালা বসান হয়েছে এবং কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টাও হচ্ছে। এ সব জায়গাগুলোর চেহারা বদলে গেছে। বাঁকুড়ায় বর্তমানে কংসাবতী নদীকে বেঁধে চাষের জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কংসাবতী নদীর খাল কাটার কাজ আমাদের দেওলাগড়া গ্রামের কাছেই হচ্ছে। যাতায়াতের পথে তুই দেখেছিস্। বাঁকুড়া জেলার ৪ লক্ষ একর আর মেদিনীপুর জেলার ৪ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পাবে। হুগলী জেলাতেও ৩০ হাজার একরে জল দেওয়া হবে। কংসাবতী (কাঁসাই), শিলাবতী (শিলাই), আর কুমারী এই তিনটি নদীকে খাতড়ার কাছে বাঁধা হচ্ছে। এরই নাম কংসাবতী পরিকল্পনা। এর জলাধার তৈরি হচ্ছে আমাদের গ্রামের তিন মাইল দূরে। বাঁকুড়া জেলার চেহারা একেবারে বদলে যাবে।

এক সময় বাঁকুড়া জেলার একটা অঞ্চল খুব সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার সিল্কের শাড়ী ভারতের সর্বত্র যেত। বিষ্টুপুরী শাড়ী। তাছাড়া পেতল কাঁসার কাজও ছিল। এখানকার আর একটা জিনিষেরও খুব নাম আছে—বিষ্টুপুরী তামাক। বিষ্টুপুরের আরও একটা নামজাদা জিনিষ আছে—কি বলতে পারিস্? গান। গোপেশ্বরবাবুর নাম শুনেছিস্? আমাদের আসরে তো এসেছিলেন। রমেশবাবুর আজকাল নাম হয়েছে। এককালে মস্ত মজলিস ছিল।

পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। এই বিষ্ণুপুরের রাজারা এক সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বর্গীদের যখন কেউ হটাতে পারত না, সারা ভারতবর্ষে যখন তারা দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছিল, এই বিষ্টুপুরের রাজার সৈন্যরা তাদের ঠেকিয়েছিল। তখনকার দিনে এরা খুব শক্তিশালী ছিল।

বিষ্টুপুরের রাজার সৈন্যদের এত জোর ছিল যে বর্গীরা বারবার চেষ্টা করেও এদের হটাতে পারে নি। রাজারা ছিল পরম বৈষ্ণব। তার চিহ্ন বিষ্টুপুর সহরের সর্বত্র ছড়ান আছে। কত বড় বড় মন্দির আর কি অপূর্ব কাজ। অথচ অবাক কাণ্ড এত বড় বড় মন্দির যারা করেছিল তারা নিজেদের বাড়ী ভাল করে করেনি। এখানে দুটো কামান আছে। এখনও গেলে দেখতে পাওয়া যায়। নাম দল মাদল। কিংবদন্তী যে মদনমোহন নিজে এই দল মাদল কামান নিয়ে লড়াই করেছিলেন। মদনমোহন ছিলেন বিষ্টুপুরের রাজাদের বিগ্রহ। এখন বাগবাজারে মহা ধূমধামে তাঁর পূজো হয়। প্রবাদ যে বিষ্টুপুরের মদনমোহনকে কারা চুরি করে এনে কলকাতার জয়মিত্তিরের কাছে বিক্রি করে গেছলো। এখনও বিষ্টুপুরে গেলে সেই হারানো দিনের কথা মনে পড়বে। কত বড় বড় দিঘী। এপার ওপার দেখা যায় না।

এইসব জায়গাগুলোয় যখন আসি তখন মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বার বার করে আমাদের অতীতের কথা মনে হয়। আবার যখন কাল পীচের রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাথার ওপরে ইলেকট্রিকের তার, চারদিকে বড় বড় ইস্কুল দেখি, তখন মনে হয় একালটাই ভাল। আগের যে সমৃদ্ধি ছিল তাতে যেন দেশের ১৬ আনা লোকের যোগ ছিল না। সে যেন অন্ধকার গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে ঝাড় লণ্ঠনের চোখ ধাঁধানো আলো। আজকের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এ যেন সবাই মিলে অনেকগুলো আলো জেবলেছে—সকলের ঘরের অন্ধকারই যেন কেটে গিয়ে আলোয় ভর্তি হয়ে উঠেছে। আমাদের বাংলার 'সমাজ' কথার অর্থই এই। সম উপসর্গের সঙ্গে গমনার্থক অজ্ ধাতু যুক্ত হয়ে 'সমাজ' কথাটি হয়েছে। অর্থাৎ যারা সমভাবে চলে। সেইজন্যই আমার মনে হয় সমাজ কথাটার একটা সার্বজনীন রূপ আছে। আজকের দিনে দেশের যে সমৃদ্ধি তার মধ্যে এই সামগ্রিক রূপ দেখতে পাচ্ছি। সকলের জন্যই ইস্কুল, সকলের জন্যই বিদ্যুত, সকলের জন্যই হাঁসপাতাল, সকলের জন্যই রাস্তা।

সকলের জন্যই নদী উপত্যকা পরিকল্পনা। অন্যগুলোও ধর না। ইঞ্জিনও সব্বাইকার জন্য। সারও তাই, ইস্পাতও তাই, জাহাজও তাই,

বিষ্ণুপুরের জোড়া-বাংলা মন্দির—শ্রীঅজিত গুপ্ত
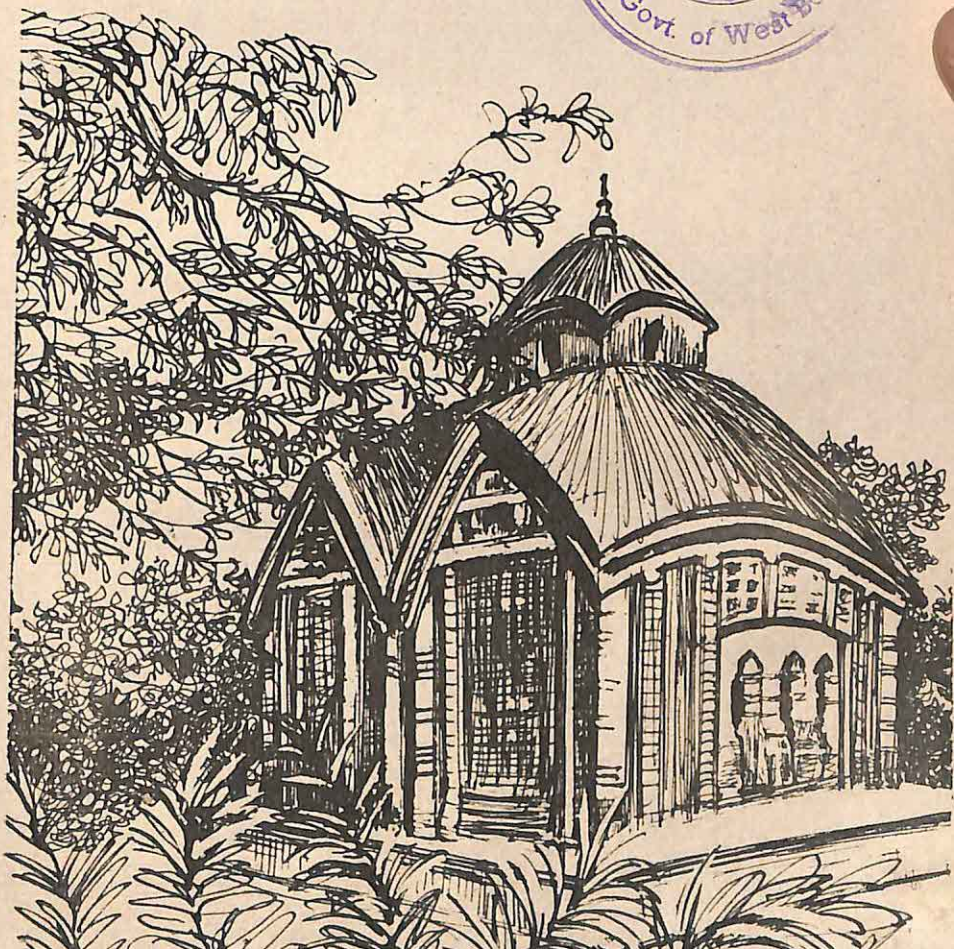
আবার পেনিসিলিনও তাই। এ যেন এক বিরাট যজ্ঞশালায় সকলে মিলে সমিধ সংগ্রহ করে আনছে, সকলে আহুতি দিচ্ছে এবং সকলেই প্রসাদ পাচ্ছে। পূজারীও সকলে আর পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেও সকলে। আগের দিনে যেন একজনের বাড়ীর পূজায় সকলকে প্রসাদ পাবার আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। তাতে অনেকেই বঞ্চিত হতো এবং যারা বঞ্চিত হতো তাদের গ্লানির সীমা থাকত না। সেইজন্য মনে হয় আজকের সমৃদ্ধি আমাদের সমাজের পূর্ণ পরিচয় দিচ্ছে। এ বিষয়ে তোর মত কি? ভক্ত চলে যাবে। দেরী হয়ে গেল।

জ্যেঠু।

গিরিডি
২৪।১।৬০ ইং
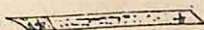
মাঙকুমা,

কালকের চিঠিটা শেষ হয়নি। আমরা আরম্ভ করেছিলুম খেলার মাঠের বিশৃঙখলা নিয়ে। তাতে যে জায়গায় এসে পড়া গেছে শ দুই তিন পাতা ব্যবহার করলে হয়ত খানিকটা লেখা হবে। এতেও মহারাণীর রাগ। ও বলছে খালি অশোক নিয়েই হাজার পাতা লেখা উচিত।

ভারতবর্ষে ইংরেজ যে পথ গ্রহণ করেছিল সেটা যে খুব ভেবে চিন্তে করেছিল তা নয়। ঘটনাচক্রে হয়ে গেছল। কিন্তু তারপর থেকেই বৃটীশ ইণ্ডিয়া ও ফিউডেটরী ষ্টেট্স্ এই দুটোকে ভাগ করে রাখবার চেষ্টা করেছিল। কার্যতঃ অনেক জায়গায় খুব পার্থক্য দেখা গেছল। বিদেশী শোষণ সত্ত্বেও বৃটীশ ইণ্ডিয়ার অধিকাংশ জায়গায়ই উন্নত হয়েছিল। অবশ্য অন্য স্বাধীন দেশের তুলনায় তাকে উন্নতি বলে না। যে সব দেশীয় রাজ্য ছিল তার সঙেগ তুলনায় উন্নত হয়েছিল। বৃটীশ ইণ্ডিয়ার মধ্যে কংগ্রেসের মারফৎ বিভিন্ন অঞ্চলের লোক একত্রিত হচ্ছিল সেটা 'নেটিভ্ ষ্টেট'এ অত দানা বাঁধতে পারে নি, সেইজন্যই ইংরেজ যখন এ দেশ ছেড়ে চলে গেল, ভেবেছিল যে তারা সরাসরি ইংরেজের সঙেগ সম্পর্ক রাখবে এবং ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তার ষড়যন্ত্র যে আরম্ভ হয় নি তাও নয়। অধিকাংশ রাজাই গোপনে শলা পরামর্শ আরম্ভ করেছিল। কিন্তু বল্লভভায়ের অসাধারণ সাহস এবং অনন্যসাধারণ কূটবুদ্ধির কাছে তারা হেরে গেল। একদিকে কতগুলো রাজাকে সরাসরি ভয় দেখালেন যে জোর করে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। তারা আপত্তি করলে কোনরকম privy purse দেওয়া হবে না। আর অন্যদিকে কয়েকজন রাজাকে ইউনিয়ন-এ ঢোকার স্বপক্ষে মত করিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ও এমন কুশলতার সঙেগ করেছিলেন যে ইচ্ছে থাকলেও

ইংরেজ কোন সুবিধে করতে পারে নি। এই যে ৬০০'র উপর দেশীয় রাজ্য, যাদের ভারতবর্ষের উপর কোন টান ছিল না, তাদের বিনা রক্তপাতে যে একত্রিত করতে পারলেন এইটেই বল্লভভায়ের কৃতিত্ব। এইখানেই Germany's integration -এর সঙ্গে তফাৎ।

এইবার যে কথা আরম্ভ করেছিলুম। অশান্তির এই বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে অরাজকতা হয় নি। অথচ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অশান্তি ও অরাজকতা সাধারণতঃ ঘটে থাকে। আমাদের দেশে সেইজন্যই যখন নতুন নতুন আইন হচ্ছে, মানুষ যখন বহুদিনের পরাধীনতার পরে স্বাধিকারের নূতন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে সেই সময় এত বড় দেশের কোন কোন অংশ তাদের অধিকার প্রমাণ করবার জন্য নানা ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই ব্যস্ততাই নানা আকারে দেখা দিচ্ছে। আমার কথাটা বোধহয় একটু শক্ত হলো। সহজ ভাষায় বলতে গেলে নবজাত শিশু হামাগুড়ির পর উঠে দাঁড়িয়েছে, চলবার চেষ্টার জন্য বার বার পড়ে যাচ্ছে। এই সময় একান্ত মমত্ববোধ নিয়ে যদি তাদের সাথী হওয়া যায় তাহলেই তারা ঠিক ভাবে চলতে শিখবে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সব বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে তা বন্ধ নিশ্চয়ই করতে হবে কিন্তু এমন মনোভাব নিয়ে করতে হবে যাতে শক্তির স্ফুরণ গঠনের কাজে নিযুক্ত করতে পারা যায়। চলতি কথায় আমরা বলি ইঞ্জিনের ষ্টীম হয়েছে এবার লাইন পেতে নিয়ে চলো। এই রকম মনোভাব দেশের মধ্যে যত বাড়বে ততই বিশৃঙ্খলা কমবে। এ বিষয়ে তোর মত কি?

খেলার মাঠের খবর? চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে তো সব? মহারাণী বলছে না গিয়ে ভালই করেছি। Grapes are sour—কেমন! অথবা বোধ হয় না যাওয়াই ভাল।

জ্যেঠু।

গিরিডি
২৫।১।৬০ ইং

মাংকুমা,

খেলার মাঠের উচ্ছৃংখলতা নিয়ে রাজনীতির একটা অধ্যায় তোকে লিখেছি। কাল আরেকটা অধ্যায়ের বার্ষিকী। পুরুলিয়ায় পেঁছনো নিয়ে তো আর বেশী কিছু লেখবার নেই। পুরুলিয়ার কথা তো তোরা জানিস্। এটার নাম ছিল মানভূম জেলা। রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে মানভূম জেলার অর্ধেকটা বিহারে আছে আর অর্ধেকটা এসেছে বাংলায়। যেটা বাংলায় এসেছে তার নাম হয়েছে পুরুলিয়া—যেটা বিহারে আছে তার নাম ধানবাদ। অর্থাৎ মানভূম নামটা লোপ পেয়ে গেল। অথচ একদিন বাঙালী কত গল্প করত এই কয়েকটি ভূমের নাম করে। মানভূম, সিংভূম, ধলভূম—ঘাটশীলা প্রভৃতি অঞ্চলকে ধলভূম বলে। টাটা লাইনে ধলভূমগড় বলে স্টেশন আছে। আর মল্লভূম কাকে বলে বল দিকিন? বিষ্টুপুরকে। বীরভূমের নামতো জানই। ইংরেজের সময় যাতায়াতের সুবিধে দেখে এক একটি জেলা এবং প্রদেশ গড়ে উঠেছিল। সেইজন্য কংগ্রেস প্রথম থেকেই বলে এসেছে যে—ভাষাভিত্তিক প্রদেশ হোক। সেই অজুহাতেই মানভূমের অর্ধেকটা ভেঙে বাংলায় এলো। এর জন্য যদিও অনেক চেষ্টা আমরা করেছি কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে যা ছিল তাই বুঝি ভাল। এটা করতে গিয়ে যত হাংগামা হলো তা ভাবলে এখনও শিউরে উঠতে হয়। ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা হয় এটা ঠিক কিন্তু ক্রমাগত ভাষাভিত্তিক—ভাষাভিত্তিক করে করে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা খানিকটা এসে গেছে। ফলে আমরা যে ভারতীয় সে কথা অনেক সময় ভুলে যাই। অথচ আমাদের দেশের সত্যিকারের পুনর্গঠন অর্থাৎ শিল্পে, কৃষিতে, অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী হওয়া নির্ভর করছে 'ভারতীয়' এই বোধের ওপর। টুকরো

টুকরো করে যদি নিজেদের দেখি অর্থাৎ উড়িষ্যা ওড়িয়ার জন্য, বাংলা বাঙগালীর জন্য, আসাম আসামীর জন্য তাতে আমরা কখনও সমৃদ্ধ হতে পারব না। সেইজন্যই মনে হয় আমাদের কাজের ফলে আমরা যে ভারতীয়,—এই বোধ অনেক পরিমাণ নষ্ট হয়েছে।

পরোক্ষভাবে ইংরেজের কাজের ফলে এবং প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের চেষ্টায় খানিকটা ভারতীয় বোধ আমাদের মধ্যে জন্মেছে। সেইজন্যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আমাদের প্রয়োজন। আমাদের দেশ বহুদিন অবহেলিত ছিল। এই দেশের সমৃদ্ধি মানে দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ। এই সামগ্রিক কল্যাণকে কখনও খণ্ডরূপে দেখা যায় না। অথচ সেইভাবে আমরা দেখবার চেষ্টা করি আর তাতেই যত অনর্থ হয়। এই খণ্ড বুদ্ধি থেকেই আমরা নানা অভিযোগের সৃষ্টি করি। আমরা বলি যে আমাদের অঞ্চলে ইস্কুল হলো না, হাঁসপাতাল হলো না প্রভৃতি। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনে যে ইঞ্জিন তৈরী, বিশাখাপত্তমে যে জাহাজ তৈরী, সিন্দ্রি আর নাঙগলে যে সার তৈরী বা অন্যান্য জায়গায় যে সব কল কারখানা হয়েছে—পেনিসিলিন তৈরীর জন্য, ডি. ডি. টি. তৈরীর জন্য, লেদ্ তৈরীর জন্য, সিমেণ্ট তৈরীর জন্য—আমরা ভুলে যাই যে এগুলো সবই ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকের প্রয়োজনের জন্য তৈরী হচ্ছে। কোন বিশেষ অঞ্চলের উপকারের জন্য এ সব কারখানা নয়। এই ধর না তিনটে ইস্পাত তৈরীর কারখানা—দুর্গাপুর, ভিলাই ও রুরকেল্লায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। আর বহুদিন এখন খরচ করেই যেতে হবে। তার পর ইস্পাত তৈরী হবে, কারখানাগুলো সম্পূর্ণ হবে। তারপর এই সব কারখানা তৈরীর সার্থকতা লোকে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ তখন আয় ব্যয়ের একটা সমতা হবে। কিন্তু গড়বার জন্য যে সময় লাগে তখন তো খালি খরচই হয়। তার পরিবর্তে যেটা পাওনা সেটা তো চোখে দেখা যায় না। তাহলে কি এই সব গড়ার কাজ বন্ধ করা হবে? এই জন্যই পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনা মানেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, অপেক্ষাকৃত অল্পমেয়াদী পরিকল্পনা এবং স্বল্পদিনে ফল পাওয়া যাবে এমন পরিকল্পনা। এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে এত হৈ হৈ, এর মানেটা কি? এর মূল

কথা হচ্ছে আমরা স্বাবলম্বী হতে চাই। অথচ স্বাবলম্বী হতে গেলে যে সব কল, কারখানা, বা অন্যান্য যে সব জিনিষ উৎপাদন হওয়ার প্রয়োজন, একসঙ্গে সেই অনুযায়ী আয়োজন করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। সেইজন্যই আমাদের গোড়ায় ঠিক করে নিতে হয়েছে দেশকে স্বাবলম্বী করতে হলে প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস কি কি এবং তার পর আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম পাঁচ বছরে আমরা এতটা করব। দ্বিতীয় পাঁচ বছরে এতটা করব—তৃতীয় পাঁচ বছরে আর এতটা। আপাততঃ এইভাবেই সমস্ত জিনিসটাকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। একে বলে phased programme। যে সব দেশ অনগ্রসর—অর্থাৎ যারা খুব দরিদ্র তাদের উন্নতি একমাত্র এই-ভাবেই হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে গড়ার সময়টায় উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। একটা ঘর তৈরী করতে গেলে অনেক মাল মসলা কিনতে হয়। মাল মশলা কেনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কেউ সে ঘরে শুতে চায় তবে সেটা অন্যায় করা হবে। তুই তো ভাক্‌রা নাঙ্গল প্রোজেক্ট ও দামোদর পরিকল্পনা দুটোই দেখেছিস—কত কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম দিকে বড় বড় নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কেন নেওয়া হল? কারণ স্বাবলম্বী হবার প্রথম কথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আর আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া খুবই সম্ভব। সেইজন্য বড় বড় নদীর জলগুলো ধরে নিয়ে তাকে জন-সাধারণের সেবায় নিয়োগ করা হচ্ছে। খালের মধ্য দিয়ে জলগুলো নিয়ে গিয়ে জমির ধারে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে—জমি উর্বরা হচ্ছে। এতে এক-দিকে বন্যায় যে জলের অপচয় হতো এবং শস্যের যে সর্বনাশ হতো সেটা বন্ধ হয়েছে। অন্য দিকে নদী নালার অভাবের জন্য যে সব অঞ্চলে একেবারে জল নেই সে সব অঞ্চলে জল নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর তাছাড়া বড় বড় বাঁধ হওয়া মানে তাতে মাছের চাষ হচ্ছে। জমি উর্বরা হচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। চাষের পরেই তো বিদ্যুৎ দরকার। কারণ আমরা ছোট ছোট কারখানা করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো তৈরী করে নিতে চাই। এই ভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেইজন্য

যখন বিচার করতে হবে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা সে তো কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য নয়। কাজে কাজেই কেউ যদি বলে তার অঞ্চলে কিছু হলো না তাহলে বুঝতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তার নেই। এই জন্যই আমি আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে কোন বিশেষ অঞ্চল নিয়ে আগ্রহ বাড়লে সংকীর্ণতা এসে পড়ে। রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপার অনেকের মনে এই সংকীর্ণতা এনে দিয়েছে। 'ভারতবর্ষ এক' বার বার কেবল এ কথা উচ্চারণ করলেই ভারতবর্ষ এক হবে না। আমাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এবং আমাদের সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কারণে ভারত-বর্ষের এক থাকার প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনো শক্তিজোটে যুক্ত না হয়েও শক্তিশালী থাকবার জন্য ভারতবর্ষের এক হওয়ার প্রয়োজন। আর প্রয়োজন আমরা যে আদর্শ গ্রহণ করেছি সে আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য। পৃথিবীর মাঝে আমাদের দেশ থেকে বার বার এ কথা বলা হয়েছে যে মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করতে হবে, সব মানুষ সমান, কোন দেশ অন্য দেশের চেয়ে বড় হবে না, বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে গান্ধী অবধি বার বার একথা বলে গেছেন! বুদ্ধ ধর্মের মারফৎ বলে গেছেন, গান্ধীজী বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে তাকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। ৪০ কোটি লোকের ভারতবর্ষ—নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে যখন বার বার একথা প্রমাণ করবে যে মানুষের এ ছাড়া বাঁচবার পথ নেই সেই দিনই আমাদের আদর্শ সার্থকতার পথে খানিকটা শক্তি পাবে। মুস্কিল হচ্ছে আদর্শ ঘোষণা করা এক জিনিস আর তার রূপ পরিগ্রহ করেছে তা প্রত্যক্ষ করা আরেক জিনিস। কারণ এটা তো প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ পথে যত বিচরণ করা যাবে তত আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা এত স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হবে যে মনে হবে যে আরও অনেক ধাপ বাকি। এই যে পঞ্চশীলের নীতির কথা আমরা বলি এ তো খালি এক দেশের প্রতি আরেক দেশের আচরণ নিয়ে নয়। বান্দুং কন্‌ফারেন্স দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে এক দেশের প্রতি অন্য দেশের আচরণেই বুঝি পঞ্চশীলের নীতি সার্থক হবে। কিন্তু সেই দেশের মানুষগুলির আচরণের উপরেই তো নীতি ও আদর্শের সার্থকতা নির্ভর করছে।

ধরে নেওয়া যাক ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে Dictatorship অনুসরণ করছে। আর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পঞ্চশীলের নীতি অনুসরণ করছে। এটা তো পুরো গোঁজামিল। এতো রাজনীতির ক্ষেত্রে সাময়িক চলবার একটা উপায় মাত্র এবং কমিউনিষ্টদের সঙ্গেও এখানেই আমাদের বিবাদ। আমরা চাইছি প্রত্যেক মানুষ কোন বাইরের চাপ ছাড়া নিজের জীবনে পঞ্চশীলের নীতি আচরণ করুক। এইরূপ প্রতিটি মানুষ নিয়ে যে দেশ সেই দেশই প্রকৃতপক্ষে পঞ্চশীলের নীতির ধারক ও বাহক হবে। কোথায় লেখা আরম্ভ করেছিলুম আর ধীরে ধীরে দর্শনের উচ্চ পর্যায়ে এসে পড়েছি। আমাদের মত লোকের এর সহজ মীমাংসা খুঁজে পাওয়া দায়। পাতার পর পাতা ভর্তি করলে তবে যদি এটাকে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। অপাণ্ডিত রামকৃষ্ণ কিন্তু অতি সহজে এর মীমাংসা করে দিয়েছিলেন—একটি মাত্র কথায়—"যত মত তত পথ"। অর্থাৎ কারুর মতই ফেলবার মত নয় এবং নিজ নিজ মতানুযায়ী সত্যকে গ্রহণ করার পথে যদি মানুষ বিচরণ করে তাহলে তার লক্ষ্যে সে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারবে। কয়েকটি মাত্র শব্দ দেওয়া একটি কথায় রামকৃষ্ণ সমস্ত দর্শনের সার কথা বলে গেছেন। মানসিক এই ঔদার্য এবং অপরকে গ্রহণ করার এবং বোঝার জন্য যে মানসিক বিস্তৃতি এই তো সব আদর্শের মূল কথা।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬০।

রেডিয়োতে আরম্ভ করেছে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'।

ওটার মানে যদি হয় : 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি মানুষ হয়ে', তাহলেই ২৬শে জানুয়ারীও সার্থক আর আমাদের আদর্শও সার্থক।

জ্যেঠু।

পাহাড়তলী
৭.২.৬১

মাঙকুমা,

Plane-এ করে দিল্লী আসবার সময় সমস্ত জায়গাটাকেই একটা দেশ বলে মনে হয়। উপর থেকে কোন তথাৎ বোঝা যায় না। আর ভাগ যা হয়েছে তা তো মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি বাস করে। তাদের ঠিকানার জন্য দেশের নামপত্তন হলো। তারপর হলো সমাজ, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ। তারপরে আবার ধর্ম। অবশ্য ধর্মের সঙ্গে বিশেষ দেশের কোনও সম্পর্ক নেই। খৃশ্চানরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। মুসলমানও তাই। বৌদ্ধদেরও তাই বলা যায়। কোথাও একই ধর্মাবলম্বীর প্রাধান্য বিশেষ বিশেষ দেশ স্বীকার করে নিলেও একথা বলা যায় না যে, একই ধর্মাবলম্বী যত জায়গায় আছে সেইগুলোকে এক দেশ বলা যায়। ভারতবর্ষে আজকাল National integrity-এর কথা উঠেছে। এটা ভাল এবং আমাদের মধ্যে এই ভাবধারার প্রসার হওয়া উচিত। কিন্তু তাড়াতাড়ি করে তো এটা হবে না। Nation-এর ঠিক বাংলা অর্থ হয় না। মোটামুটিভাবে এক দেশবাসী বোঝায়। দেশের অর্থ এখানে একেবারে রাজনৈতিক সীমানা। ভৌগোলিক সীমাও নয়। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে একই অঞ্চলের লোক, যারা একই সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা অনুশীলন করতে চায়। অবশ্য এতেও অনেক তর্ক উঠতে পারে। যদি একই রকম অধিকার ভোগের কথা থাকে তাহলে সমস্যা তো আরো বেড়ে যাবে। আমরা প্রচলিত কথায় যাকে 'আমেরিকা' বলি অর্থাৎ U.S.A., সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই তো একরকম অধিকার ভোগ করে না। যেমন নিগ্রোরা। তাহলে কোন সূত্রে তারা দেশবাসী? বিলেতেও তাই, অর্থাৎ U.K.-র রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং Jew-রা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাহলে কি তারা এক দেশবাসী নয়? যদি

অধিকারের সংজ্ঞার উপর এক দেশের বোধ নির্ভর করে তাহলে তো অনেক জায়গাতেই সেটা খাটে না। ধর্মের দিকেও খাটে না, অধিকারের দিকেও খাটে না, আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়মের দিক দিয়েও খাটে না—সেইজন্য একমাত্র definition হতে পারে, রাজনৈতিক সীমানার দ্বারা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বিশেষ বিশেষ দেশ বলা হয়। এই জন্যই একদেশবাসী এই বোধ আসতে দেরী হয়।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক্। ভারতবর্ষ নাম হয়তো অনেক-দিন আছে, কিন্তু ভারতবাসী কোনও দিন ছিল বলে আমার মনে হয় না। ধর্মের দিক থেকে অবশ্য আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলি তার সমগ্রতার দিক থেকে একটা অনুভূতি ছিল, কিন্তু একই দেশের অধিবাসী এ ধারণা কোনও দিন ছিল না এবং এ ধারণা অনুযায়ী দেশকে এক কর-বার চেষ্টাও কখনও হয়নি। শঙ্করাচার্যের যে চারটি মঠ, যাকে প্রচলিত কথায় আমরা ধাম বলি, একটি হলো উত্তরে বদরিকাশ্রম, একটি পশ্চিমে দ্বারকা, একটি দক্ষিণে রামেশ্বর এবং আর একটি পূর্বে পুরী। আজকের যে ভারতবর্ষ, সেই সমগ্র ভারতবর্ষের মাটি ছুঁয়ে তবে এই চার ধামের তীর্থযাত্রা হতো। কিন্তু সেটা তীর্থ করা। এক দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া নয়। যেমন বহু দেশের মুসলমান 'মক্কা'য় যান।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্য হয়েছে। বেশ বড় আয়তনের। যেমন বিম্বিসার-অশোকের সাম্রাজ্য। আয়তনে খুব বড়, কিন্তু এটা কোনও একটা দেশ ছিল না। কতকগুলো রাজ্য বা দেশ জয় করে মৌর্যদের অধীনে রাখা হয়েছিল। এই রাজ্য বা দেশগুলোকে একত্রিত করবার চেষ্টা কেউ করেনি। সে বোধও ছিল না। সাম্রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সময় হয়েছিল, হর্ষবর্ধনের সময়ও সেটা ছিল, কিন্তু সেটা রাজ্যজয় মাত্র। আকবরের সময় বেশ ভাল সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু সেটা বিভিন্ন রাজ্যকে একত্রিত করার ভিত্তিতে নয়। রাজ্য জয় করে সেগুলো পৃথক রেখে প্রত্যেকটার উপর আলাদাভাবে প্রভুত্ব করার জন্য। ভূমিরাজস্ব নিয়ে টোডরমল যে নীতি নিয়েছিলেন তাতেও একদেশ এই ভাবের কোনও প্রসারতা হয়নি। ইংরাজের আমলে নানা কারণে আমরা ভাবতে শিখি

এবং কংগ্রেসের আমলে এইটে রূপ পায়। কিন্তু প্রথমদিকে তাতেও ছেদ ছিল। ৬৩৫টি দেশীয় রাজ্য তাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত মনে করতো না।

অবশ্য ধীরে ধীরে একদেশ এই ভাবের প্রসারতা হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক দিন লাগবে। অস্থির এবং অধৈর্য না হয়ে যদি চেষ্টা করা যায় তাহলে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক সীমাকে আমরা হয়তো একদিন এক দেশ ভাবতে পারবো। এতে দুঃখের কিছু নেই—যেটা কোনও দিন ছিল না এবং এখনও নেই সেটার অভাব বলে যখন অনেকে ক্ষোভ করেন, তখন দুঃখও পায়, হাসিও আসে। যা নেই তা হারিয়েছি বলে দুঃখ করবো কেন! এটা তো পরম সত্য যে আমরা এই-ভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছি। এইটাই তো লাভ। আমরা যারা আরম্ভ করে যাচ্ছি তাদের কোনও দুঃখেরই কারণ নেই। কেননা আরম্ভটাই দরকার ছিল। আমাদের জীবনে যেটা হলো না তোদের জীবনে যদি সেটা রূপ নেয় তাতে দুঃখের বা ক্ষোভের কি আছে? আমরা তো কিছু হারাইনি এবং আমরা যে নতুন ভাবে ভাবতে শিখছি এটা উপলব্ধি করলেই অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং ভাবধারা অধিকতর প্রসার-লাভ করবে।

অনেক লেখা হয়ে গেলো। মহারাণী তো কাছে নেই, আমার আঙুল টন্‌টন্ করছে।

জ্যেঠু।

পাহাড়তলী
৯.২.৬১.

মাঙকুমা,

অনেক ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে একবার তারকেশ্বরে গেছলি মনে আছে কি? সেই বোধহয় তোর প্রথম তারকেশ্বর যাওয়া। বাড়িতে তাই নিয়ে অনেক ঠাট্টা হয়েছিল। তোর বুঝি কি মানসিক ছিল। দিনে মানুষ থাকতিস্ আর রাতে একটি জীববিশেষে পরিণত হতিস্। তোর ডাক নাম, আর সেই জীববিশেষকেও সেই আদরের নামে ডাকা হয়। মনে পড়ছে কি? সে তো অনেক দিনের কথা। তারপর তো দেশের চেহারা বদলে গেছে। তারকেশ্বরে যাবার Electric Train হয়েছে, চওড়া কাল পীচের রাস্তা দিয়ে অসংখ্য Bus যায়। তারকেশ্বরের ভিতরের রাস্তাও ভাল হয়েছে। আরও কত সুখ-সুবিধা। কিন্তু তখনও দেখতুম মানুষ কাঁধে বাঁক নিয়ে বৈদ্যবাটীর 'নিমাইতীর্থের' ঘাট থেকে গঙ্গাজল নিয়ে তারকনাথের পূজো দিতে যাচ্ছে। এই সব পথটা হেঁটে। এখনও তাই। Electric Train-এ করে যেখানে টুক্ করে যাওয়া যায়, সেখানে এতটা পথ এই রোদে, বৃষ্টিতে, ঠাণ্ডায় কেন বাঁক ঘাড়ে হেঁটে যাওয়া! একটি ছেলে বলে উঠলো, "কি অন্ধ বিশ্বাস!" আমি একটু চমকে গেলাম। এই যাওয়ার কি এ-ই একমাত্র মানে! এই যে হাজার হাজার লোক দিনের পর দিন শরীরের কষ্টকে অস্বীকার করে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে এটা কি এক কথায় অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়! আর কারা যাচ্ছে? ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোনও পার্থক্য নেই। মেয়ে-পুরুষের গণ্ডী কাটিয়ে সামাজিক ব্যবধানের পার্থক্য ভেঙ্গে দিয়ে এই যে দিনের পর দিন বাঁক-ঘাড়ে সহস্র সহস্র মানুষ যাচ্ছে, তাকে কি এককথায় নির্ণয় করা যায়! অথবা কোনও ধরা-বাঁধা পথে বিশ্লেষণ করা যায়! আর অন্ধবিশ্বাস কথাটার কি কোনও মানে আছে?
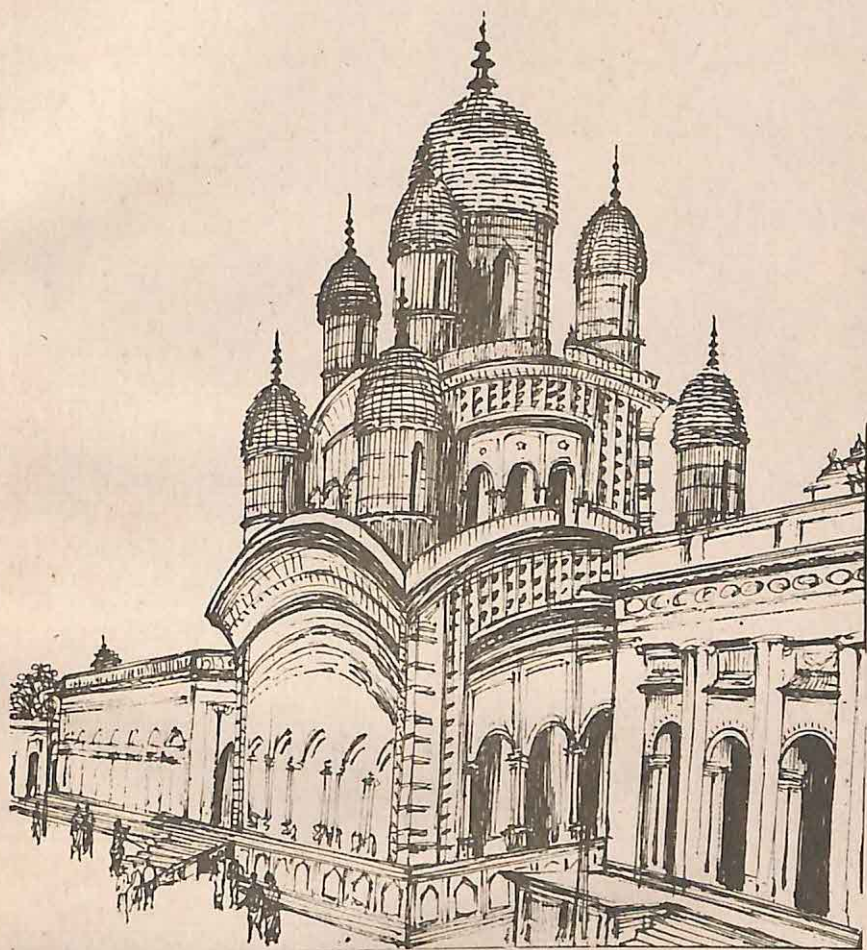
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির—শ্রীঅজিত গুপ্ত
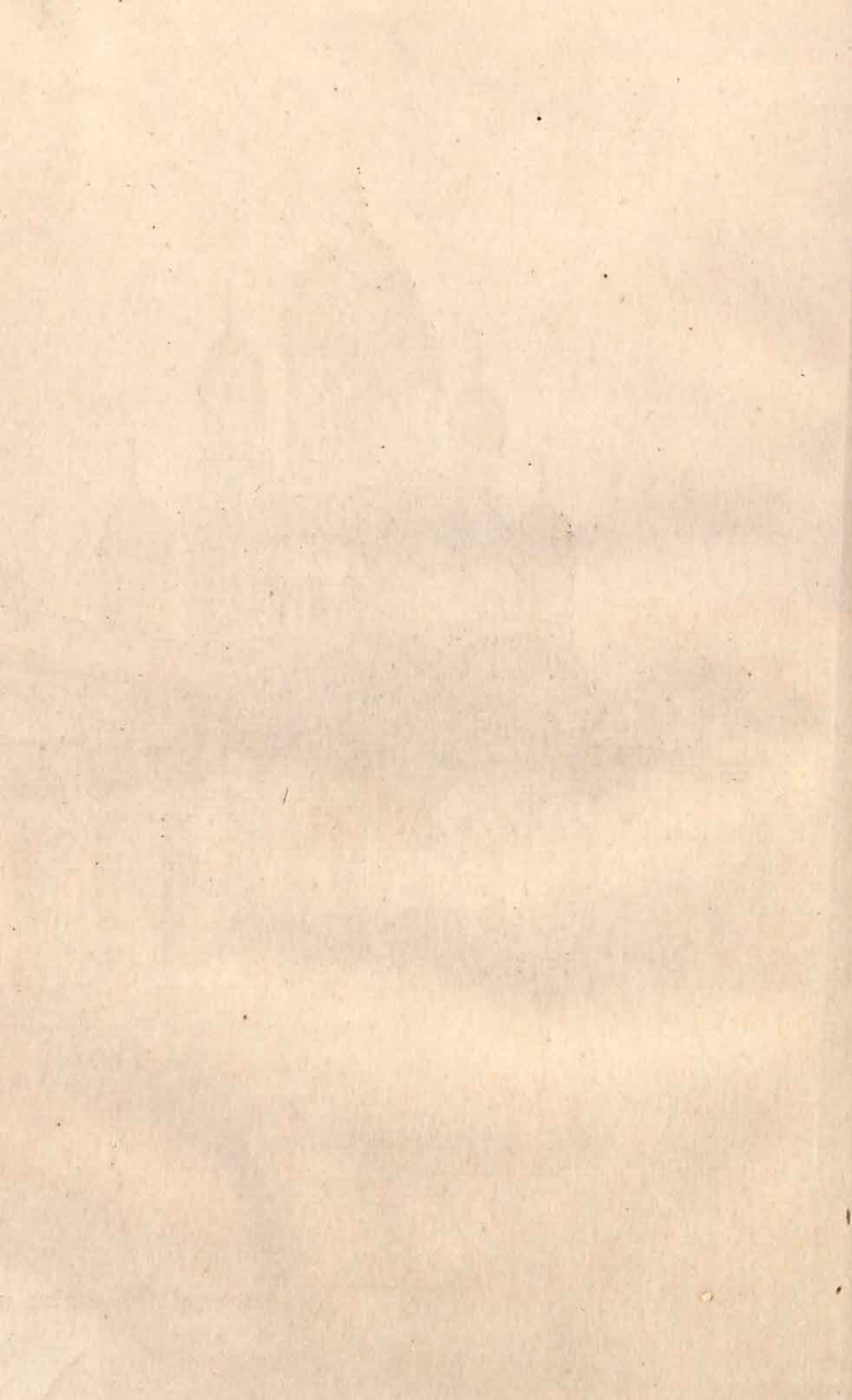
পৃথিবীর কত আবিষ্কার কত invention তো ভুল পথে গিয়ে, অনুশীলন করে হয়েছে। Koestler তাঁর Sleep Walker বইয়ে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাছাড়া একথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু যারা প্রথম আরম্ভ করে তারা তো এই বিশ্বাস নিয়েই করে যে, শেষ ঠিকানায় পৌঁছানো যাবে। কিন্তু আরম্ভের সময় যুক্তিগ্রাহ্য মাল-মসলা তাদের হাতে তো কিছুই থাকে না। তারা তো অখন্ড ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই এগোয়। আর এই অবিশ্বাসকে অস্বীকার করবার চেষ্টায় কত যে বিপর্যয় হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সত্যই তো, এতে লজ্জা কি? বুদ্ধ এই মানে খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যখন সাধনা আরম্ভ করেন তখন বিশ্বাস নিয়েই সুরু করেছিলেন।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

কিন্তু বুদ্ধত্ব লাভের পর সব জিনিষই যুক্তিগ্রাহ্য এইটা বোঝাতে গিয়ে পৃথিবীতে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত জড়বাদের আরও প্রাধান্য দিলেন। Spengler এটা খুব ভাল বলেছেন।

"Each Culture, further, has its own mode of spiritual extinction, which is that which follows of necessity from its life as a whole. And hence Buddhism, Stoicism and Socialism are morphologically equivalent as end-phenomena.

For even Buddhism is such. Hitherto the deeper meaning of it has always been misunderstood. It was not a Puritan movement like, for instance, Islamism and Jansenism, not a Reformation as the Dionysiac wave was for the Apollinian world, and, quite generally, not a religion like the religions of the Vedas or

the religion of the Apostle Paul, but a final and purely practical world-sentiment of tired megalopolitans who had a closed-off Culture behind them and no future before them. It was the basic feeling of the Indian Civilization and as such both equivalent to and "Contemporary" with Stoicism and Socialism. The quintessence of this thoroughly worldly and unmetaphysical thought is to be found in the famous sermon near Benares, the Four Noble Truths that won the prince-philosopher his first adherents. Its roots lay in the rationalist-atheistic Sankhya philosophy, the world-view of which it tacitly accepts, just as the social ethic of the 19th Century comes from the Sensualism and Materialism of the 18th and the Stoa (in spite of its superficial exploitation of Heraclitus) is derived from Protagoras and Sophists. In each case it is the all-power of Reason that is the starting-point from which to discuss morale, and religion (in the sense of belief in anything metaphysical) does not enter into the matter. Nothing could be irreligious than these systems in their original forms—and it is these and not derivatives of them belonging to later stages of the Civilization, that concern us here.

Buddhism rejects all speculation about God and the cosmic problems; only self and the conduct of actual life are important to it. And it definitely did not recognize a soul. The standpoint of the Indian psychologist of early Buddhism was that of the West-

ern psychologist and the Western "Socialist" of today, who reduce the inward man to a bundle of sensations and an aggregation of electro-chemical energies. The teacher Nagasena tells King Milinda that the parts of the car in which he is journeying are not the car itself, that "Car" is only a word and that so also is the soul. The spiritual elements are designated Skandhas, groups, and are impermanent. Here is complete correspondence with the ideas of association-psychology, and in fact the doctrines of Buddha contain much materialism."

Oswald Spengler—
"The Decline of the West"

যুক্তিবাদ Rousseau খুব চালু করেছিলেন। তার ফলে ফরাসী বিপ্লবের সময় যুক্তিদেবীর পূজা হয়েছিল এবং ধাক্কা সামলাবার জন্য ফরাসী দেশ যে রক্তপিচ্ছিল পথ গ্রহণ করে, সারা ইউরোপকে প্রায় ৫০ বছর ধরে সেই রক্তমোক্ষণের গ্লানি ভোগ করতে হয়। এখনও বোধ হয় ফ্রান্স সেই সময়ের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের গ্লানির চাপ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। Marx-এর যুক্তিবাদকে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাশিয়ার কমিউনিস্টরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। লেনিনের ব্যাখ্যা, স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা, আরও কত ব্যাখ্যা! কতকগুলো ব্যাখ্যাকে রাশিয়াতেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর ব্যাখ্যাকাররাও নিস্তার পাননি। বিপ্লবের অন্যতম জনক Trotsky-কে শুধু রাশিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো তা নয়, হাতুড়ীর আঘাতে তাঁকে জীবনও দিতে হলো। Red Army-র স্রষ্টার নাম রুশ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। আর কতজনের যে সমাধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একজনের কথাই ধরা যাক্—Bukharin। Marx-এর ব্যাখ্যাকার যেমন হয়েছিলেন Engels তেমনি Russia তে Communism-এর বড় ব্যাখ্যাকার

হয়েছিলেন Bukharin, তাঁর ঐতিহাসিক জড়বাদের নীতিবোধ লিখে। এ তো গেল বুদ্ধিজীবীর কথা। কর্মীরাও কি নিস্তার পেয়েছেন? স্টালিনের কি অবস্থা হয়েছে এবং আরও কি হতে চলেছে। মানে খুঁজতে গিয়ে তো এই হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু লেখায় বার বার করে বলেছেন—তাঁর লেখার যেন কোনও বিশেষ মানে খোঁজা না হয়। কিন্তু কে শোনে সে কথা। এ বিষয়ে Camus ভাল বলেছেন।

" . . . . . . So long as the mind keeps silent in the motionless world of its hopes, everything is reflected and arranged in the unity of its nostalgia. But with its first move, the world cracks and tumbles: an infinite number of shimmering fragments is offered to the understanding. We must despair of ever reconstructing the familiar, calm surface which would give us peace of heart. After so many centuries of inquiries, so many abdications among thinkers, we are well aware that this is true for all our knowledge. With the exception of professional rationalists, to-day people despair of true knowledge. If the only significant history of human thought were to be written, it would have to be the history of its successive regrets and its impotences.

Of whom and of what indeed can I say: 'I know that!' This heart within me I can feel, and I judge that it exists. This world I can touch, and I likewise judge that it exists. There ends all my knowledge, and the rest is construction. For if I try to seize this self of which I feel sure, if I try to define and summarize it, it is nothing but water slipping through

my fingers. I can sketch one by one all the aspects it is able to assume, all those likewise that have been attributed to it, this upbringing, this origin, this ardour or these silences, this nobility or this vileness. But aspects cannot be added up. This very heart which is mine will forever remain indefinable to me. Between the certainty I have of my existence and the content I try to give to that assurance, the gap will never be filled. For ever I shall be a stranger to myself. In psychology as in logic, there are truths but no truth. Socrates' 'Know thyself' has as much value as the 'be virtuous' of our confessionals. They reveal a nostalgia at the same time as an ignorance. They are sterile exercises on great subjects. They are legitimate only precisely in so far as they are approximate.

And here are trees and I know their gnarled surface, water and I feel its taste. These scents of grass and stars at night, certain evenings when the heart relaxes—how shall I negate this world whose power and strength I feel? Yet all the knowledge on earth will give me nothing to assure me that this world is mine. You describe it to me and you teach me to classify it. You enumerate its laws and in my thirst for knowledge I admit that they are true. You take apart its mechanism and my hope increases. At the final stage you teach me that this wondrous and multicoloured universe can be reduced to the atom and the atom itself can be reduced to the electron. All this is good and I wait for you to continue. But you tell me

of an invisible planetary system in which electrons gravitate around a nucleus. You explain this world to me with an image. I realise that you have been reduced to poetry: I shall never know. Have I the time to become indignant? You have already changed theories. So that science that was to teach me everything ends up in a hypothesis, that lucidity founders in metaphor, that uncertainty is resolved in a work of art. What need had I of so many efforts? The soft lines of these hills and the hand of evening on this troubled heart teach me much more. I have returned to my beginning. I realize that if through science I can seize phenomena and enumerate them, I cannot for all that apprehend the world. Were I to trace its entire relief with my finger, I should not know any more. And you give me the choice between a description that is sure but that teaches me nothing and hypotheses that claim to teach me but that are not sure. A stranger to myself and to the world, armed solely with a thought that negates itself as soon as it asserts, what is this condition in which I can have peace only by refusing to know and to live, in which appetite for conquest bumps into walls that defy its assaults? To will is to stir up paradoxes. Everything is ordered in such a way to bring into being that poisoned peace produced by thoughtlessness, lack of heart or fatal renunciations."

Albert Camus—
"Myth of Sisyphus"

তোকে ওঁর Outsider পড়তে দেওয়া আমার ভুল হয়েছিল। ওটা কারুর কারুর morbid লাগে। তবে অনেকে যে বলেন Camus-এর উপর Sartreএর ছাপ আছে, সেটা ভুল।

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি। তারকেশ্বরে বাঁক কাঁধে করে হেঁটে যাওয়া দিয়ে তো সুরু করেছিলুম। যুক্তিবাদ দিয়ে দেখলে তো আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

কি পাথর দিয়ে তারকনাথের শিলা সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙলে তা থেকে কি কি জাতের পাথর বেরুবে, এই রকম আরও কত কি! সেইটাই কি বর্তমান সভ্যতার চালু পথ হবে? এই যে এতগুলো লোক দিনের পর দিন যাচ্ছে, তার কি নিজস্ব কোনও মানে নেই! মানুষগুলো কি যন্ত্র যে, সকলেই একভাবে এক বিচারপদ্ধতি নিয়ে যাচ্ছে! এই একভাবে ভাবা ও এক পদ্ধতি নিয়ে বিচার করার বিরুদ্ধেই আমাদের যা কিছু প্রচেষ্টা। এইখানেই তো Communist-দের সঙ্গে মূলগত প্রভেদ। কেউ একজন হঠাৎ বলে বসলো যে তারকেশ্বরে যারা যাচ্ছে, তারা পাপ খণ্ডনের জন্য যাচ্ছে। এরও তো আরও একটা দিক থাকতে পারে। যার মনের মধ্যে পাপের কোনও কথা নেই, সেও তো কেবলমাত্র পুণ্য অর্জনের জন্য যেতে পারে।

আমরা negative দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করি অথবা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী positive—এই তর্ক, বিরোধ ও বিবাদ তো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এ বিষয়ে তোর মত কি? আমার কথা হচ্ছে এই যে এতগুলো মানুষ যাচ্ছে, এটাই আমার কাছে খুব বড় কথা। কারণ, এখানে প্রত্যেকটি মনাুষ সম্পূর্ণ এবং একক। মানুষকে বাদ দিয়ে পাপপুণ্যের বিচার বা সুখসমৃদ্ধির আয়োজন, কোনোটাই সার্থক হতে পারে না।

রাশিয়া তো সেই চেষ্টাই আরম্ভ করেছিল। মানুষের সুখ ও শান্তি আনতে হবে যাতে মানুষের নিজের পৃথক অস্তিত্ব থাকবে না। সব হবে এক ছাঁচে ঢালা। একমত ভাববে, একভাবে বিচার করবে, এটা তো Robot সৃষ্টি করা হবে। তার জন্য তো পৃথিবীও নয়, আর মনুষ্য-সমাজও নয়। মানুষকে বাদ দিয়ে তার চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করার

উদ্ভট কল্পনা কখনও সার্থক হতে পারে না। তোর বন্ধুরা কেউ কেউ হয়তো আমাকে 'Lotus'-পন্থী (Koestler—Lotus & the Robot) বলবেন। সেটাও ভাল Robot হওয়ার চেয়ে। এ বিষয়ে তোর মত কি?

চিঠি গুরুগম্ভীর হলে সেটার রসমাধুর্য ক্ষয়ে গিয়ে সেটা শুষ্ক প্রবন্ধে পরিণত হয়। আর যে প্রবন্ধের আগা এবং গোড়া থাকে না সেটা প্রবন্ধের পরিবর্তে কবন্ধে পরিণত হয়। তোর কাছে 'কবন্ধ'ও হয়তো সায়েস্তা হয়ে থাকে। সেইজন্য এ চিঠি পাঠাতে দিচ্ছি।

জ্যেঠু।

জয়পুর
২০।৯।৫৯

মাঙকুমা,

অসুখ করলে রাজস্থানে Changeএ যাওয়া যায় একথা আমার কেন, কারোরই হয়ত জানা ছিল না। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে এবং মোহনলালের অনুরোধে জয়পুরে আসতে হয়েছে। যখন কোলকাতা থেকে বেরোই মনে একটা অবিশ্বাসের ভাব ছিল। এখানে এসেও যে অবিশ্বাসের ভাবটা কেটে গেছে তা নয়, তবে জ্বরটা বন্ধ হয়েছে, আর অবাক কাণ্ড, এই September মাসেও পাখা খোলার দরকার হচ্ছে না। এটা তো মরুভূমি বল্লেই চলে, কিন্তু দুফোঁটা বিষ্টি পড়ে চারদিকে সবুজের শ্যাম সমারোহ। এ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আর হাজার হাজার ময়ূর। ময়ূরের পেখম তুলে নাচের কথা শুনেছিলুম—এখানে এসে চোখে দেখলুম, তাও ডজনে ডজনে। জ্বরটা বন্ধ হতেই একবার অনেকদিনের ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। বাঙালীদের কাছে রাজস্থান, বিশেষ করে মেবার প্রায় তীর্থস্থানের মত। বাংলাভাষায় যে কত বই আছে তার ইয়ত্তা নেই। চিতোর, উদয়পুর ও হলদীঘাট ঘুরে এলুম। ইতিহাসের পাতায় কত মানুষ এসেছে গেছে—বাঙালীর মনে রাণা প্রতাপ এখনও যে আদর্শ, বীরত্ব ও রোমান্সের সৃষ্টি করে তা খুব কম লোকই করতে পেরেছে। এর আগে চিতোর দেখেছিলুম—ডাঃ রায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার অল্প আলোয়। এবারে দিনের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলুম। যেন অতিকায় একটা জানোয়ার তার কঙ্কালের স্তূপ নিয়ে পড়ে আছে। এখন জায়গায় জায়গায় মেরামত করা হচ্ছে। নানা উৎসবের মাধ্যমে লোককে চিতোরের কথা স্মরণ করাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তাতে তো মন ভরে না! আজকের ছেলে-মেয়েরা কি মনে করবে জানি না, কিন্তু যখন পড়েছিলুম যে চিতোরের

মেয়েরা শত্রুর হাতে ধরা দেওয়ার চেয়েও আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সুখকর মনে করেছিল সেকথা মনে হোলে আজও গা' শিউরে ওঠে। রাজনীতি, দর্শন ও মানবতার তত্ত্ববিচারে জহরব্রতকে আজ কি পর্যায়ে ফেলা হবে জানি না, কিন্তু আমার মনে এটা এখনও পরম মহত্ত্বের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। যে নির্ভীকতায় মানুষ জীবিত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে তা' নিশ্চয়ই মর্যাদায় অনন্যসাধারণ। আর একজন দুজন নয়, শত শত মহিলা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন-ভাবে আর কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। যদি ঘটে থাকে তাও স্মরণীয়। এই জহরব্রতের পুণ্যপীঠ চিতোর তার অতীতের স্মৃতি নিয়ে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজকের দিনে জড়বাদের কষ্টি-পাথরে যখন সব যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে তখন এ ঘটনার দাম কি? মূল্যবোধের বিচারে এ' ঘটনাকেও হয়তো দুর্বলতা বলে প্রমাণ করা চলবে, কিন্তু আমি তা' স্বীকার করি না। নিজস্ব ভঙ্গীতে মেবারের মেয়েরা একটা পথ গ্রহণ করেছিল এবং মনে করেছিল যে অসম্মান বরণ করে যে বাঁচা সে বাঁচা টিঁকে থাকার নামান্তর। তাতে বাঁচার মর্যাদা থাকে না। একটা উন্মুক্ত জায়গা দেখিয়ে সঙ্গী বললেন যে জহরব্রতের স্থান। এখনও ওখান থেকে ছাই পাওয়া যায়।

চিতোর দুর্গের ভাঙা তোরণগুলি আবার মেরামত হচ্ছে। প্রাসাদ-গুলিও জোড়াতালি দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আজকের দিনের পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে জহরব্রতের জায়গা বিশেষ স্থান পায়নি। তাতে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, জীবনকে কি আমরা বর্তমানে কম মূল্য দিচ্ছি? রাজপুত মেয়েরা জীবনের মূল্য দিত বলেই বিনা দ্বিধায় মৃত্যুকে বরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সমীক্ষা নিরীক্ষা না করেও তাদের মনের অগোচরে হয়তো এই ভাবই জেগেছিল যে কোনও রকমে টিঁকে থাকা জীবনকে অমর্যাদা করা। এই বোধ যত সমাজের মধ্যে জাগবে তত সমাজ গ্লানি ও কলুষমুক্ত হবে। আমি একথা বলছি না যে জহরব্রত আজকের দিনে সময়োচিত হবে। আমি একথা বলতে চাইছি—যে মনোভাব নিয়ে রাজপুত মহিলা বিনা দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সেই মনোভাবের অনুশীলনে আমাদের সমাজ থেকে আজ অনেক

অন্যায় দূর হতে পারে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে তো কোনও ত্রুটি নেই। মেয়েরা ভোটের অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার সবই পেয়েছে। কিন্তু সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীলতা এখনও এই সব অধিকারের মর্যাদা দিতে পারেনি। মেয়েদের মধ্যে যত বেশি জীবনকে সম্মান দেওয়ার ভাব আসবে তত বেশি করে তারা অবমাননার হাত থেকে নিস্তার পাবে। এটা তো মেয়েদেরই সুরু করতে হবে। ইংল্যান্ডে ভোটের অধিকার পাবার জন্য মেয়েরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক মেয়ে স্বেচ্ছায় নিগৃহীতা হয়েছেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দেশের অধিকাংশ মেয়ের সম্মান যদি এখনও ক্ষুণ্ণ হতে থাকে তাহলে স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। একটা দেশের স্বাধীনতার অর্থ হোল সে দেশের মানুষের সর্বপ্রকার বিকাশের পথের অন্তরায় দূর হওয়া। অসম্মান যেখানে প্রচণ্ড, সেখানে বিকাশের সুযোগ প্রতি পদে ব্যাহত হয়। যেসব পুরুষ মেয়েদের বিকাশের পথের অন্তরায় দূর করতে এগিয়ে আসবেন তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারাই তো এটা সম্ভব নয়! আজকের দিনে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে বহু মেয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু তার পিছনে যদি সজীব প্রাণের চেতনা না থাকে তাহলে সেটা তো মামুলি গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করার নামান্তর হবে। বিয়ের কথাই ধরা যাক্। একদা আমাদের সমাজে নিয়ম ছিল জ্ঞান হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া। তাতে সুবিধা ছিল এই—যে নতুন বাড়ীতে মেয়েরা যেত, চেতনার অভাবের জন্য সে বাড়ীকে আপন করে নিতে তাদের খুব কষ্ট হোত না। সামাজিক তত্ত্ববিচারে এ' প্রথা আজ বর্জিত হয়েছে। এ' প্রথা যে বর্জিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে কারোর মনে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে এই যে আর কোনও প্রথার সৃষ্টি হয়নি। এখনও সাধারণভাবে সমাজে এই নিয়ম আছে যে পরিণতবয়স্কা মেয়েদের অজানা পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অপরিচিত পরিবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করতে হবে, কাউকে মা বলে সম্বোধন করতে হবে, কাউকে দাদা বা দিদি

বলে সম্বোধন করতে হবে। যুক্তিহীন পদ্ধতি অনুসরণের এই প্রাণহীন প্রচেষ্টার জন্য আজ সমাজে অনেক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ' পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা মেয়েদেরই করতে হবে। তাতে সাময়িকভাবে হয়তো অশান্তি এবং সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি এখানে সমাজ সংস্কারের কোনও ইংগিত করছি না, কারণ সমাজ বলতে যা বোঝায় আজ তার একটা ভুয়ো কাঠামো আমাদের দেশে দাঁড়িয়ে আছে। কাজে কাজেই তা সংস্কারের চেষ্টা না করে তাকে ভেঙে ফেলাই সংগত হবে বলে আমি মনে করি। এতে সাময়িকভাবে উচ্ছৃংখলতা বাড়বার ভয় থাকলেও চিরদিনের জন্য একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে। একাজে মেয়েদেরই তো এগুতে হবে। জহরব্রতের দেশে বসে বসে এই কথাগুলোই বারবার মনকে পীড়া দিচ্ছে।

আমাদের কবি লিখেছিলেন—"না জাগিলে বুঝি ভারত ললনা— এ' ভারত আর জাগে না জাগে না"। আমি জানি যে ভারতললনা জেগেছে। তাই তোর কাছে এত কথা লিখতে পারলুম।

জয়পুরের ময়ূরের নাচের সংগে আমার এ চিঠির কোনও সামঞ্জস্য রইলো না। কাজে কাজেই এখানেই শেষ করলুম।

জ্যেঠু।